আমরা করবো জয়

বাসন্তী দেবী কলেজ
লকডাউন
সাময়িক পত্রিকা
২০২০-২০২১

সূচীপত্র

শিক্ষার আলো
পূজা হালদার

ভালোবাসার দিনলিপি
সুকন্যা মিত্র

করোনায় অসহায়- দের মুখে হাসি
দিশা সুই

অজানা মহামারী
অর্পিতা মন্ডল

মহামারী করোনা ভাইরাস
সৃষ্টি সাহা ও রিয়া সেনগুপ্ত

করোনা আতঙ্ক ও সচেতনতা
অরুমিতা চক্রবর্তী

হাত বাড়াও
ময়ূরী দেবনাথ

অনাহার
মনীষা হালদার

আম্ফান-এর অভিজ্ঞতা
বিপাশা চ্যাটার্জী

করোনার ভয়াবহ সংকটের মধ্যে অনলাইন ক্লাস এর সুবিধা ও অসুবিধা
সাথী আদিত্য ও পায়েল দাস গুপ্ত

গৃহবন্দী
সুস্মিতা কর্মকার

জীবনের ছন্দপতন
মৌমিতা দেবনাথ

আমার মা
মেঘা ক্ষত্রী

লকডাউন ডায়েরী
তৃষা নস্কর, তৃষা হালদার, জয়িতা ঘোষ, আত্রেয়ী কর্মকার, সর্বাণী গোলদার

অতিমারি
মৌমিতা ঘোষ

ছন্দহীন কবিতারা
সঙ্ঘমিত্রা চক্রবর্তী

পরিস্থিতির চিত্রকল্প
প্রমিতা ভট্টাচার্য

Acceptance
Anushka Banerjee

Embrace The Change
Aheli Ghosal

Time Management
Ishita Bhattacharya

Dealing With the Pandemic Situation
Shaona Ganguly

Minding our minds during the (COVID-19)
Tina Dey

You are not alone
Shubhangi Dey

How do you deal with depression?
Ishita Bhattacharya

Uncertainties of life
Ayushmita Ghos

Learning to live with a Pandemic
Sreejita Ghosh

PRINCIPAL'S NOTE

It is heartening to see that this online magazine, the first of its kind to be published by the college has finally come into existence. Amidst the darkness of the present time created by the outbreak of Covid-19 Corona Virus, this endeavour of the students of the Departments of Philosophy, Sociology, Women's Studies, Psychology and Psychological Counselling Cell is really appreciable. Corona Virus has altered our life including teaching-learning process. Online education has emerged as an alternative system to classroom teaching. During this time the publication of this online magazine is an honest effort to bring out the creative thoughts and expressions of students by overcoming the negativity and looking into positivity. I hope it will be a pleasant experience to go through this magazine. I wish this publication a great success.

The sudden outbreak of COVID-19 pandemic in 2020 had put a halt on our everyday life, forcing schools, colleges & Universities to close their doors, impacting an unprecedented number of learners worldwide. During this period of uncertainty and crisis, the best solution to continue teaching learning & evaluation process was through online mode which gradually became the new normal. Consequently, the teaching faculty & the Students of Basanti Devi College quickly adapted to this new mode of disseminating knowledge and continued with the uninterrupted teaching-learning process. Apart from curriculum based online classes we also encouraged & provided a platform to our talented students to showcase their creative thoughts and expression. The idea of publishing online magazine by the teachers & students of the Department Philosophy, Psychology, Sociology & Counseling Cell of our college is most encouraging.

On behalf of The IQAC of our college, I, appreciate the above initiative. This Online Magazine is an honest effort to showcase the innovative & interesting articles, poems & artwork of our gifted students during the lockdown phase.

I believe that the students who have contributed to this Online Magazine will be overwhelmed when they will see their articles published and it will give them a sense of self-satisfaction which will boost their self-confidence.

I express my sincere gratitude to our respected Principal for her constant support throughout the process, from the conceptualization of the idea to the last stage of publication of this grand endeavor undertaken by our teachers & students.

I hope that the articles, poems & artwork of our gifted & innovative minds will captivate the imagination of the readers.

Dr. Aditi Sarkar
Associate Professor,
Dept. of Education & Coordinator, IQAC
Basanti Devi College, Kolkata

FOREWARD

This magazine is an humble presentation of expressing thoughts and ideas of students during the period of lockdown. From March, 2020 everybody is passing through a very tough time because people are thrown away from their regular, habitual life-style to fight against covid-19 corona virus by staying at home. The teacher-student community is also not an exception. Teachers and students staying at home, resume regular classes.

To get rid of boredom of isolated lives, students of the Departments of Philosophy, Psychology, Sociology and Psychological Counselling Cell engaged themselves in some creative activities like writing stories and articles, drawings and paintings specially related to this pandemic situation. Then came the idea to combine these to be published in the form of an online-magazine. But both teachers and students have been occupied with a very busy schedule of online classes, examinations and webinars throughout the period of lockdown due to which the publication of the journal has been delayed a little. The scenario from the early days of lockdown has changed to the currently ongoing new-normal phase of unlock. People from other sectors have partially rejoined their duties maintaining precautionary measures directed by Government whereas the educational sector is still maintaining a busy schedule from home.

This online magazine is presented to the readers with the expectation that they will enjoy it very much. This magazine is an outcome of the efforts of the students with guidance from the teachers and overall the kind support of Principal Madam who has extended her inspiration and support as usual. Thanks to be given to Principal Madam for being with the efforts of the students during this challenging and critical time. Special thanks are due to Dr.Aditi Sarkar, IQAC Coordinator of Basanti Devi College and to Dr.Upasona Ghosh, Convenor of Magazine Committee and also to Prof. Sandhya Naskar and Dr. Malobika Sarkar who are senior members of Magazine Committee for rendering their support .Thanks to be given to all of the teachers and also to the non-teaching staffs of the college for being with this work. And the last but not the least, very special thanks to be acknowledged to Mr.Anjan Chatterjee who took over the entire responsibility to prepare this online magazine. We dreamt and Mr. Chatterjee helped to make our dream come true.

পূজা হালদার
দর্শন বিভাগ
চতুর্থ সেমেস্টার

শিক্ষার আলো

এ বছর দোল পূর্ণিমাতে বেশ কিছু দিন ছুটি পেয়েছিলাম। সোমবার দোল ছিল, তাই শনিবার খুব মজা করে বন্ধুদের সাথে দোল খেলেছিলাম। তারপর রবিবার ছুটি ছিল আর দোল ও হোলির জন্যে সোমবার ও মঙ্গলবার ছুটি ছিল। তিন দিনের টানা ছুটিতে আমি মায়ের সাথে মায়ের মামার বাড়ি গিয়েছিলাম । ওটা ছিল লক্ষ্মীকান্তপুরের একটা গ্রাম। সেই গ্রামে সবাই খুব গরীব। বাচ্চারা স্কুলে যায় কিন্তু খুব কম সংখ্যায়। ছেলেরা স্কুলে গেলেও মেয়েরা আজও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। একটু বড়ো হলেই মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। এমনি এক অসহায় দিদির সঙ্গে আমার আলাপ হল। দিদির নাম আলো। আমরা পুরো বন্ধুর মতো হয়ে গিয়েছিলাম। দিদির কলকাতা দেখার খুব ইচ্ছে ছিল, তাই ওখান থেকে ফেরার সময় দিদিকে আমার সাথে কলকাতায় নিয়ে আসি। কথা ছিল দু-সপ্তাহ থেকে তারপর ২৫ তারিখ নাগাদ বাড়িতে ফিরে যাবে। সব কিছু বেশ ভালই চলছিল, এমন সময় শোনা গেল সারা বিশ্বে ও ভারতবর্ষেও কোরোনা ভাইরাস মহামারি রূপে ছড়িয়ে পড়েছে। এই কারণে ১৭ই মার্চ থেকে কলেজও বন্ধ হয়ে যায়। এই রোগে বহু মানুষ আক্রান্ত হতে থাকে এবং অনেকের মৃত্যু হয়। এই রোগ ছড়িয়ে পড়া আটকাতে ভারত সরকার সারা দেশে ২৩শে মার্চ থেকে লকডাউন করে দেয়। সব রকম যাতায়াতের মাধ্যম বন্ধ হয়ে যায়, তাই আলো দিদির বাড়ি যাওয়াও বন্ধ হয়ে যায়। একে কোরোনায় রক্ষা নেই, তার ওপর মে মাসের ২০ তারিখে আমফান নামে একটা ভয়ঙ্কর ঝড় এসে সব তছনছ করে দিয়ে যায়। এই ঝড়ে হাজার হাজার মানুষের প্রচুর ক্ষতি হয়। ঝড়ের প্রচণ্ড দাপট ও বৃষ্টির ঝাপটায় বারান্দার দরজা আর ছাদের সিঁড়ি দিয়ে হুড়হুড় করে জল ঢুকছিল ঘরে। আমি,

মা আর দিদি মিলে ঘর থেকে প্রায় কুড়ি থেকে তিরিশ বালতি জল বের করেছিলাম। পর দিন সকালে দিদির সঙ্গে বারান্দায় গিয়ে দেখি বাড়ির সামনেটা ধ্বংসস্তূপের মতো দেখাচ্ছে। আমার প্রিয় রাধাচূড়া গাছটা ভেঙে পড়ে আছে। মনটা খুব খারাপ লাগছিল আর ভাবছিলাম এখন হাওয়া দিলে রাস্তাটা আর হলুদ ফুলে সাজবে না। দিদিকে বললাম, এই ধ্বংসস্তূপ আর জমা জল দেখে আমার ২০১৫ সালের বর্ষাকালের কথা খুব মনে পড়ছে। তখন আমরা সোনারপুরের একটু গ্রামের দিকে মাঠের পাশে ছোট্ট একটা ঘরে ভাড়া থাকতাম। তার পাশে একটা পুকুর ছিল। ওই পুকুরটা বর্ষার জলে জলপূর্ণ ছিল। প্রতিদিন বৃষ্টি হতো আর লক্ষ্য করতাম মাঠে জল জমছে। দিন দিন জলের পরিমাণ বেড়ে যেত। একদিন দেখলাম জল মাঠ পূর্ণ করে রাস্তায় ও বাড়ির উঠানে উঠে এসেছে। ঐ জলে অনেক বিপদ ছিল- ওতে মাছ, সাপ, জোঁক আরও অনেক কিছুই ছিল। মা তখন প্রতিদিন ওই জল পেরিয়ে বিপদ মাথায় নিয়ে দু বেলা দু- মুঠো খাবার জোগাড় করার জন্য কাজে আসত। মা সকালে রান্না করে আমার খাবার গুছিয়ে দিয়ে কাজে যেত আর রাতে বাড়ি ফিরত। তখন আমার কাছে কোনো ফোন ছিল না। সারা দিন বাড়িতে একা থাকতাম। বিকেলে যখন দিনের আলো শেষ হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসত, তখন আমার খুব ভয় করত। আমি মায়ের অপেক্ষায় রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে থাকতাম। যদিও তখন ওটা রাস্তা ছিল না, জলে ডুবে পুকুর হয়ে গেছিল। মাঝে মাঝে আমার মনে হত আমি বুঝি কোনো দ্বীপে বাস করি। চারিদিকে জল আর মাঝখানে আমি একা বসে আছি। এই ভাবে এক সপ্তাহ কাটিয়ে ছিলাম। কিন্তু পরিস্থিতির কাছে হার স্বীকার করতেই হল। একদিন রাতে খুব ঝড়বৃষ্টি হল, পরদিন ভোর বেলা ঘুম ভেঙে দেখি ঘরে এক হাঁটু জল, হাঁড়ি, কড়া সব ভাসছে। মা আমাকে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে বললেন। দরকারি জিনিস, আমার পড়ার বই ব্যাগে গুছিয়ে আর ঘরের বাকী জিনিস খাটের ওপর তুলে রেখে, সময় নষ্ট না করে বাড়ির থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পিঠে ভারী ব্যাগ নিয়ে এক হাতে ছাতা আর অন্য হাতে নুনের কৌটো নিয়ে এক কোমোর জলে নেমে

পড়লাম । নুনটা জোঁক ধরলে কাজে লাগবে। বাড়ির থেকে বড়রাস্তায় আসতে কুড়ি মিনিট লাগে কিন্তু সেদিন চল্লিশ মিনিট লাগল। মায়ের হাতটা শক্ত করে ধরে কোনো মতে জল পেরিয়ে বড়রাস্তায় এলাম। তারপর সেখান থেকে মামারবাড়ি। সত্যি, আজ খুব মনে পড়ছে সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোর কথা। দিদি পুরোটা শুনে তো অবাক। আমি বললাম, শুনতে গল্প মনে হলেও পুরোটাই বাস্তব, গল্প হলেও সত্যি। হঠাত খেয়াল হল ঘড়িতে ১০ টা বাজে, অনলাইন ক্লাস আছে। তাই আর গল্প না করে পড়ার ঘরে চলে এলাম। দিদিও পড়ার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। আমি লক্ষ্য করতাম, আমি যখন ক্লাস করি দিদি আমাকে খুব মন দিয়ে দেখে। আবার কখনো বই গুলোকে নাড়াচাড়া করে। আমি একদিন দিদিকে বললাম, তুমি বই পড়বে ? দিদি বললো, আমি বই পড়ব ? আমি তো লেখাপড়া জানি না। কোন ছোটবেলায় একবার স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম অ – আ শিখতে না শিখতেই পয়সার অভাবে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়। দু-বেলা ঠিক করে খাবার জুটতো না তাই অনেক ছোটবেলায় লোকের বাড়ি কাজে চলে গেলাম, আর স্কুলে পড়া হল না। তবে খুব ইচ্ছে করে পড়াশোনা করতে, কলেজে যেতে, বই পড়ে অজানাকে জানতে। আমি বললাম, বেশ তো, তুমি পড়বে আমার কাছে ? আমি তোমাকে এই লকডাউনে লেখাপড়া শেখাব, যতটা পারি। শিখবে তুমি ? দিদি বললো, আমি কি পারব ? আমি বললাম, নিশ্চয় পারবে, ইচ্ছে থাকলে সব কিছু জয় করা যায়। তাই পড়াশোনাও শেখা যায় । তুমিও পারবে। এই বলে পরের দিনই অনেক খুঁজে আমার ছোট্টবেলার বর্ণপরিচয় বই সাথে খাতা – পেনসিল বের করে দিলাম। সকালে স্নান করে মা সরস্বতীর সামনে দিদিকে নতুন করে হাতে খড়ি দেওয়ালাম। তারপর থেকে রোজ নিয়ম করে দিদিকে পড়াতাম। কিছু দিনের মধ্যেই দিদির অক্ষর জ্ঞান হল। তারপর শব্দ লিখতে শিখল। যে দিন প্রথম নিজের নাম লিখেছিল সেই দিন দিদির চোখে আনন্দের জল দেখেছিলাম। আস্তে আস্তে বাক্য লিখতে ও পড়তে শিখল। লকডাউনের এই তিন মাসে দিদি অনেক কিছু শিখে গেল। যে দিন প্রথম গল্পের বইটার প্রথম লাইন বানান করে

আমায় পড়ে শোনাল সেদিন, দিদির চোখে মুখে শিক্ষার আলো দেখেছিলাম। আর মনে হয়েছিল এই কঠিন পরিস্থিতিতে লকডাউনে কিছু না পারি বাড়িতে বসে একজনকে শিক্ষার আলো দেখাতে পেরেছি। দিদির লেখাপড়া করার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। আনলক ওয়ান শুরু হলে দিদি তার বাবার সাথে বাড়ি ফিরে গেছে। দিদি কথা দিয়েছে রোজ নিয়ম করে পড়াশোনা করবে। দিদি যে দিন বাড়ি ফিরে গেল সেদিন ওই বর্ণপরিচয় বই, খাতা, পেনসিল আর সাথে ঠাকুমার ঝুলি গল্পের বই উপহার দিলাম। দিদি খুব খুশী হয়েছিল পেয়ে। দিদিকে বলেছি দিদি যে শিক্ষার আলো পেয়েছে তা আরও অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে, কারণ শিক্ষার আলো যত ছড়াবে ততই নিজেও শিক্ষার আলোয় আলোকিত হওয়া যায়। জীবনে সব কিছু ক্ষণিক, অল্প সময়ের জন্য থাকে। কিন্তু শিক্ষা আজীবন মানুষের কাছে থেকে যায়। শিক্ষাই মানুষকে অমর করে রাখে।

সুকন্যা মিত্র
দর্শন বিভাগ
চতুর্থ সেমেস্টার

ভালোবাসার দিনলিপি

"আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদর দিনে" ---

আজ ভোরবেলা থেকে অবিরাম বৃষ্টি হয়েই চলেছে। এই সবে ঘুম থেকে উঠে এককাপ গরম চা নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই বৃষ্টিভেজা সোঁদা মাটির গন্ধ পাই, আশেপাশের গাছপালা গুলো দেখে মনে হচ্ছে সেগুলো যেন আরো বেশি সবুজ এবং প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে ও তার সাথে পাখিদের কোলাহল তো আছেই। গাছের পাতায় বৃষ্টি পড়ার শব্দ আর পাখিদের কাকলি মিলে মিশে সকালের স্নিগ্ধতাকে যেন শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি বারান্দার শেষ কোনায় আমার প্রিয় গোলু- মোলু, কুট্টুস-পুট্টুসদের দিকে তাকালাম – ওরাও যেনো আজ খুব খুশী – ওদের রং বেরং এর ছোট্ট শরীর গুলো যেন আনন্দে নেচে বেড়াচ্ছে, ওরা হল মুনিয়া বদ্রী এইসব জাতের পাখি। ওদের আরোও একটা পরিচয় আছে – ওরা আমার বন্ধু – ওদের সাথে পড়াশুনার ফাঁকে আমার অনেকটা সময় কাটে। এসব দেখতে দেখতে হঠাৎ করেই বৃষ্টিস্নাত রাস্তার দিকে আমার চোখ যায়, দেখি যে একই ছাতার তলায় দুটো মেয়ে হাত ধরে গল্প করতে করতে হেঁটে চলেছে। ওদের এমন সুন্দর বন্ধুত্ব দেখে আমার একটি অতীতের স্মৃতি মনে পড়ে গেলো।

গতবছর দোলের কিছুদিন আগের কথা। আমার যে জামাটি পরে দোল খেলতে সবথেকে বেশি ভালোলাগে সেটি শত খোঁজার পরেও না পাওয়ায় অগত্যা মাকে ডাকলাম এবং মা এসেই জাদুকরের মতো আমার জামাটা খুঁজে দিল। আমার মায়ের নাম শ্রীতমা। জামাটা খুঁজে দেওয়ার পরে মা আমাকে তার কলেজজীবনের একটি গল্প বললো। আমি জানতে পেরেছিলাম যে কলেজে ভর্তি হওয়ার পর আমার মায়ের সাথে অন্য একটি ছাত্রীর খুব ভালো বন্ধুত্ব গড়ে

উঠেছিল খুব অল্প সময়েই। আমার মায়ের সেই প্রিয় বান্ধবীর নাম ছিল মধুমিতা। দুই বান্ধবীর মধ্যে বন্ধুত্ব এতটাই প্রগাঢ় ছিল যে কেউ যদি তাদের মধ্যে কোনো একজনকে ভুল করেও কোনো কথা বলতো তাহলে অপরজন ছুটে চলে আসত তার মোকাবিলা করতে। তাদের এমন সুন্দর বন্ধুত্বে হঠাৎ করেই একদিন ছেদ পড়েছিল, কারন আমার মায়ের সেই প্রিয় বান্ধবী মধুমিতা অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় নববর্ষের দিন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল কিন্তু ঠিক কী কারনে তা এখন আর মনে নেই। শ্রীতমা মধুমিতার মাকে ফোন করে তার বান্ধবীর অসুস্থতার খবর জানতে পারে। যদিও সে হাসপাতালে গিয়ে দেখা করতে পারেনি তবুও সে প্রতিদিন ফোন করে তার বান্ধবীর খবর নিত। অসুস্থতার কারনে তার বান্ধবী প্রায় একমাস কলেজে যেতে পারেনি। মধুমিতার হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন একবার দোলপূর্ণিমা পড়েছিল। সেদিন অন্যান্য বান্ধবীদের সঙ্গে দোল খেললেও শ্রীতমার মন তার কাছে ছিল না, ছিল অন্য জায়গায়, কোথায় ছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিছুদিন পরে যখন মধুমিতা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে কলেজে ফিরল তখন নাকি দুজনের চোখের জল বাঁধ ভেঙেছিল। এরপর দেখতে দেখতে কলেজে তাদের তিনটি বছর কেটে গেল। কলেজের ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করে যাওয়ার পরে তাদের যোগাযোগ ও গেল হারিয়ে। সেই সময় তো এখনকার মতো সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না। পড়াশুনা শেষ করে যে যার সংসার জীবনে প্রবেশ করল – ব্যস্ত জীবন নতুন ভাবে বইতে শুরু করল। শ্রীতমার সাথে মধুমিতার আর কোনো যোগাযোগ নেই, আসলে পরিবর্তিত যুগের সাথে মানুষের হাতে আজ যে আর সময় নেই দু-দন্ড কোথাও বসার।

এবারে আসি আমার নিজের কথায়। গতবছর দোলের ঠিক আগের দিনের কথা। আমাদের কলেজে সেদিন খুব বড়ো করে দোলপূর্ণিমার উৎসব পালন করা হবে বলে সকল ছাত্রীর অভিভাবকদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। আমি সেদিন খুব খুশি ছিলাম কারন আমার সাথে আমার মা গিয়েছিল এবং আমি আমার পছন্দের লাল এবং হলুদ আবির নিয়েছিলাম। কলেজে পৌঁছে আমি,

মিতা ও অন্যান্য বান্ধবীরা মিলে খুব মজা করে দোল খেললাম। এদের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় বান্ধবী হল মিতা। বাড়িতে মায়ের কাছে আমি মিতার অনেক গল্প করেছি । আমরা একসাথে লাইব্রেরী, ক্যান্টিন ও নানা জায়গায় ঘুরতে যাই। মা আমার কাছে মিতার এত গল্প শুনেছে যে মায়ের ওকে দেখার খুব আগ্রহ ছিল। আমি মিতার সঙ্গে যখন আমার মায়ের আলাপ করাচ্ছিলাম তখন পিছন থেকে 'মিতা' বলে কে যেন ডেকেছিল। আমার মায়ের সেদিন তার সেই অতি পরিচিত গলার স্বর চিনে নিতে কোনো ভুল হয়নি কারন আমার মা পিছনে ফিরে তার সেই প্রিয় বান্ধবী মধুমিতাকেই দেখেছিল। তারা দুজন পরস্পরকে সামনাসামনি দেখে দৌড়ে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়েছিল। সেদিন ও তাদের চোখের জল পুনরায় বাঁধ ভাঙল। প্রকৃত বন্ধুবিচ্ছেদের বেদনা যে কী প্রবল হতে পারে সেদিন আমি বুঝতে পেরেছিলাম। সেদিন দোলের রংই তাদের বন্ধুত্বে নতুন রং ভরেছিল, পূর্ণতা পেয়েছিল তাদের হারিয়ে যাওয়া দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব। এর পরে তারা একে অপরের ফোন নম্বর নিল। আমার আর মিতার কাছেও ব্যাপারটা খুবই ভালো লেগেছিল। আমাদের মায়েরা যেমন পরস্পরের খুব ভালো বন্ধু আশ্চর্যভাবে আমরাও তাই। দুই প্রজন্ম কী অদ্ভুতভাবে এক বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেলো। মায়েরা যেন আমাদের মধ্যে দিয়ে তাদের কিশোরবেলায় ফিরে গেল। কেমন একটা পারিবারিক বন্ধুত্বের চেহারা নিল এই সম্পর্ক। এখন প্রায়ই শ্রীতমা এবং মধুমিতার কথা হয়। এর পরে আবার ও একদিন তাদের দুজনের সামনাসামনি সাক্ষাৎ হয়েছিল আমার কলেজ সোশ্যালে। সেদিন আমি এবং মিতা দুজনেই শাড়ি পরে গিয়েছিলাম। সেদিন খুবই মজা হয়েছিল, সেদিন ভাল করে কলেজে সময় কাটিয়ে বেশ ভাল স্মৃতি নিয়ে সবেমাত্র বাড়িতে ফিরেছি আর তখনি টিভিতে খবর দেখে জানতে পারি সেই ভয়ঙ্কর কথা, যার জন্য আমরা আজ ও গৃহবন্দি কারন সারা বিশ্ব আজ করোনা নামক এক প্রাণঘাতি ভাইরাসের কবলে এবং এটা একটা সংক্রামক ব্যাধি ফলে এটি যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সেইজন্য সমগ্র বিশ্বব্যাপী লকডাউনের ঘোষনা করা হলো।

এই লকডাউনের ফলে আমরা আমাদের পরিবারের সঙ্গে একটু বেশি সময় কাটাতে পারছি। আমার বাড়িতে যেমন আমি, মা এবং বাবা আমাদের তিনজনের ছোট্ট পরিবার আছে তেমনি আরও একটা ছোট্ট পরিবার আছে আমার বদ্রী পাখির। এই ইট, সিমেন্ট, পাথরের জঙ্গলে আজ সবুজের বড় অভাব এবং তার সঙ্গে আরো একটি অভাব হল পাখির ডাকের। বর্তমান যুগের যেই সময়ে আমরা আছি এখন একাকীত্ব বোধ করা খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। এমন একটা সময় ছিল যখন আমিও একাকীত্ব বোধ করেছি তখন এর সমাধান হিসাবে আমার বাবা-মা আমাকে দুটো সুন্দর ছোট্ট বদ্রী পাখি এনে দেয় । এই পাখিদুটি আসায় আমার মনের নতুন জানালা খুলে যায়। এরপরে ওরা আমার বন্ধু হয়ে ওঠে। আমি ভালোবেসে ওদের নাম রাখি গোলু এবং মোলু। সকাল হতেই ওদের মিষ্টি গলার স্বর, ওদের খাওয়া-দাওয়া, স্নান করা ওদের এই জীবনযাত্রার সঙ্গে আমি ক্রমশ পরিচিত হতে লাগলাম।

লকডাউনের ফলে আমি আরো নিবিড় ভাবে ওদের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পেলাম। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে ওদের ও এখন একটি পরিবার গড়ে উঠেছে । সেই পরিবারের সদস্য সংখ্যা প্রায় দশ জন। ওরা ডিম পাড়ল সেই ডিম ফুটে ছানা বেরোল, সেই ছানা গুলো যখন বড়ো হল ওরা আমার হাত থেকেই দানা খেতে লাগল। আমার মনে হয় আমি যখন ওদের সামনে থাকি ওদের সঙ্গে কথা বলি ওরা খুবই খুশি হয়। আমি ওদের খেতে দিই, ওদের খাঁচা পরিষ্কার করে দিই তাও যেন আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আমি মানুষের প্রতিনিধি বলে ওরা হয়তো আমাকে বিদ্রূপ করে বলছে- “আমাদের যে এভাবে তোমরা এই খাঁচার মধ্যে বন্দি রাখো, তেমনি তোমরা যে এখন গৃহবন্দি আছো তোমাদের কেমন লাগছে?” । আবার মাঝে মাঝে যখন কোথাও খুব জোরে শব্দ হয় বা গান বাজে তখন ওরা ভয়ে খুব চিৎকার করে। আমার তখন মনে হয় ওরা যেন বলছে, “থামো.........তোমরা থামো, আমাদের যে কষ্ট হচ্ছে”।

এরপরে যেদিন ঘূর্ণিঝড় আমফান কলকাতার বুকে আছড়ে পড়ে সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ সমেত কোলকাতা শহর টাকে তছনছ করে দিয়েছিল সেদিন ঝড়

হওয়ার বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকেই ওরা ডানা ঝাপটাচ্ছিল, চিৎকার করছিল। আসলে কথায় তো আছেই যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে সেটা মানুষের অনেক আগে পশু পাখিরা বুঝতে পারে। ওরাও সেদিন বুঝতে পেরেছিল যে এক বিধ্বংসী ঝড় আসতে চলেছে কিন্তু আমি সেদিন কিছুতেই ওদের সেই ভাষা বুঝতে পারছিলাম না। ঝড়ের সময় ওদের খাঁচা আমি ঘরের ভিতর এনে রেখেছিলাম। আমি দেখলাম ওরা খুব শান্ত, চুপ করে এক জায়গায় বসে আছে। সেদিন আমার মতো ওরাও খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। যাই হোক সেই দূর্যোগ এখন কেটে গিয়েছে। ঝড়ের পরে ওরাও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

চারিদিকে অতিমারির আতঙ্ক - ভয় গ্রাস করছে মানুষকে – আমরা এখন গৃহবন্দী মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়ে আসে। ঠিক তখনি আমি মন ভালো করার জন্য কয়েকটা উপায় বের করে নিই – একদিকে আমার বান্ধবী মিতা, অপরদিকে আমার ছোট্ট গোলু-মোলু। মিতার সাথে ফোনে গল্প করি – গোলু মোলু কথা বলে না ঠিকই কিন্তু বন্ধুত্বের একটা নিজস্ব ভাষা আছে তা দিয়ে মিতা আর ছোট্ট পাখির সাথে আমার অন্তর যায় মিলে – আমার লকডাউনের অফুরন্ত অবসর আমাকে মন খারাপ করতে দেয় না। পাশাপাশি দেখি আমার মা ও রান্না শেষ করে তার বান্ধবীর সাথে গল্প করে। চার দেওয়ালের এই ঘেরাটোপের মধ্যেও কি অনাবিল আনন্দে মগ্ন হয়ে যায় – ভালো থাকাটাই সবচেয়ে বড়ো কথা – তাই যেমন করে অতীতের সব বাধা বিপত্তি কেটে গেছে, আমফানের দূর্যোগ যেমন কেটে গিয়েছে, তেমনি করোনা ভাইরাসের কবলে পড়ে সারা পৃথিবীর বর্তমান যে অবস্থা তাও একদিন ঠিক হয়ে যাবে। এমন একটা পৃথিবীর আশায় আমরা দিন গুনতে পারি যেখানে মুখের এবং হাতের আবরণ ছাড়া আমরা পুনরায় এক সুস্থ জীবনযাপন করতে পারবো।

দিশা সুই
দর্শন বিভাগ
দ্বিতীয় সেমেস্টার

করোণায় অসহায়_দের মুখে হাসি

একটি মহামারি মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনে কতখানি পরিবর্তন আনতে পারে তা ২০২০ সালের দিনগুলি স্পষ্ট করে দিল। আমিও এর ব্যতিক্রম নই, আমার জীবনের সেই পরিবর্তনের কথা তুলে ধরতে আজ আমার এই কলম ধরা। রোজ সকালে বাসে করে কলেজ যাবার সময় বাসের জানলার ধারে বসে দেখতাম, রাস্তার ধারে, ফুটপাতে, বস্তিতে, গাছের তলায় কত মানুষ জীবনযাপন করছে। ভাবতাম তারা কী ভাবে এরকম জায়গায় থাকে? মাথার উপর নেই কোনো ছাদ, নেই জামাকাপড়, নেই খাবার, অনাহারে দিন কাটাত। ঝড়, জল, বৃষ্টিতে গাছের তলায় আশ্রয় নিয়ে তারা কিভাবে দিন কাটায়? সকালবেলায় ছোটো ছোটো বাচ্চারা বাটি হাতে রাস্তায় ভিক্ষা করতে বেরিয়ে পড়ে। এই ভাবনাগুলো প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আমার মাথায় হাতুড়ি দিয়ে পেটাত। হঠাৎ এমনি এক সময় এই ভাবনাগুলো আরও বেড়ে গেল, যখন সারা দেশজুড়ে লকডাউন এবং ভয়ানক সংক্রমণ দেখা দিলো। এমন

সময় সেই ছোটো ছোটো অসহায় শিশুরা কী ভাবে দিন কাটাচ্ছে ? একটা প্রত্যন্ত গ্রামের ছোটো শিশু যার মধ্যে পুষ্টির অভাব সে কীভাবে থাকে ? অসহায়, ভিখারি মানুষগুলো কী ভাবে দিন কাটাচ্ছে? তারা এখন আর ভিক্ষা করতে পারছে না। এই সব ভাবনাগুলি আমাকে আগেও ভীষণভাবে পীড়িত করত এবং এখন আরও বেশি মাত্রায় ভাবাচ্ছে। এছাড়াও আমার পাড়ার আশেপাশের বস্তিতে থাকা দিন আনা দিন খাওয়া মানুষগুলো এখন কি ভাবে আছে ? অসহায় সেই সমস্ত শিশুগুলি এই পরিস্থিতিতে কেমন আছে ? অন্যদিকে আমার পাড়ার চপ কাকু ও ফুচকা কাকু রোজ বিকালে গাড়ি ভর্তি করে খাবার নিয়ে বসত। তাদের ব্যবসাও এখন বন্ধ। করোণার প্রকোপে

তাদের সংসার কিভাবে চলছে ? তাদের বাচ্চাদের লেখাপড়া আদৌ হচ্ছে? না কি তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের পথে ? শুনেছিলাম আমার পাশের বাড়ির রিক্সা কাকুর মেয়েটা পড়াশুনাতে অসাধারণ। এখন তার পড়াশুনা প্রায় বন্ধ কারণ অনলাইন ক্লাস করার মত আর্থিক সার্মথ্য তার নেই। কারণ রিক্সা চালিয়ে তাদের সংসার চলে, দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ তারা, তাই ফোন কেনার মত সার্মথ্য তার নেই, এমন কি পড়াশুনার জন্য সে কোন টিউশন ক্লাসও করতে পারে না। এখন দেখছি সে পেটের টানে পাড়ার বেশকিছু বাড়িতে পণ্যসামগ্রী জোগান দেয়, পাড়ার এক দোকান কাকুর কাছ থেকে জিনিস সংগ্রহ করে। এর পাশাপাশি প্রত্যেক দিন বিকালে তার প্রিয় বইখাতা গুলি নিয়ে বসে কেবলমাত্র তার ভেতরকার আগুণ টাকে জ্বালিয়ে রাখার তাগিদে। সে এখন ভবিষ্যতের অন্যতম এক কান্ডারি হওয়ার স্বপ্ন দেখে। এত প্রতিকূলতার মধ্যে সে তার পড়াশুনা থামিয়ে রাখেনি। এই সমস্ত কিছু দেখে আরও বেশি করে এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে লড়াই করে সাধারণ অসহায় মানুষদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছা করল। কিন্তু র্বতমান পরিস্থিতিতে

লকডাউনের কারণে কিছু নির্দিষ্ট সময় বাদে মানে যখন আমি পড়াশুনা করতাম বা নিজের কিছু কাজ করতাম সেই সময় ছাড়াও অধিকাংশ সময় ভীষণ একাকিত্ব অনুভব করতাম। মাসখানেক আগে আমি ও আমার বেশ কয়েকজন বন্ধু মিলে অসহায়, দুস্থ, অনাথ, গরীব মানুষদের পাশে দাঁড়াতে একটি সংগঠণ নির্মাণ করেছিলাম। কিন্তু পড়াশুনার চাপে সেই সংগঠণে কাজ প্রায় হত না। কিন্তু র্বতমানে দিনের অনেকটা সময় ভীষণভাবে একা লাগার দরুণ ও অসহায়, মানুষদের কথা ভেবে এই সংগঠনটি আমাদের সকল বন্ধুর মনে নতুন এক দিশা দেখিয়েছে। আমরা বন্ধু নামক এই সংগঠনটির মাধ্যমে ও পাড়ার বেশ কিছু সন্মানীয় ব্যক্তি ও ক্লাবের দাদাদের সাথে কথা বলে এই অসহায় মানুষগুলির পাশে দাঁড়াতে সচেষ্ট হয়েছি। এই লকডাউনে কয়েকজন বন্ধু মিলে নিজ নিজ এলাকায় অসহায়, নিরন্ন মানুষ গুলোর মুখে দুদানা অন্ন জোগান করতে পেরে মনে মনে ভীষণ আনন্দ অনুভব করেছি, এবং অসহায় শিশুদের মুখে হাসি দেখে নিজের মনকে একটু হলেও শান্ত করতে পেরেছি। এগুলি না করতে পারলে মনের মধ্যে একটা যন্ত্রণা থেকেই যেত। এছাড়াও আমি এই সংগঠনে থাকা বাচ্চাদের সাথে আগে পড়াশুনার কারণে দেখা করতে যেতে পারতাম না..... এখন তাদের কাছে সপ্তাহে দুদিন করে দেখা করতে যাই। তাদের এই রোগ সংক্রমণ সম্পর্কে সচেতন করি, অনেকটা সময় কাটাই

তাদের সাথে, ঘরোয়া কিছু খেলা খেলি আর অন্য কোনো দিন চেষ্টা করি তাদের পড়াশুনা বিষয়ে কিছু শেখাতে। এর ফলে লকডাউন পরিস্থিতিতে তাদের একাকিত্ব বোধ কিছুটা দূর করার চেষ্টা করি আমার সামর্থ্য মত।

এর পাশাপাশি এই সংগঠনটির মাধ্যমে আমি আমার দুজন দিদি ও তিনজন বন্ধু মিলে আমার বাড়ির নিকটস্থ একটি বৃদ্ধাশ্রমের পাশে দাঁড়িয়েছি। এই দুঃসময়ে এই বৃদ্ধ

মানুষজনদের সাথে কিছুটা সময় অতিবাহিত করার মধ্যে দিয়ে তাদের মনের মধ্যে জমে থাকা অজানা আতঙ্ক ও একাকিত্ব থেকে কিছুটা হলেও তাদেরকে মুক্তি দিতে পেরেছি। এই সকল কিছু করার মাধ্যমে নিজেকেও আনন্দিত করতে পেরেছি। প্রত্যেক রবিবার তাদের সাথে দেখা করতে যেতাম। এই সব কথা ভেবে তাদের একাকিত্ব ও মানসিক ব্যাধি থেকে স্বস্তি দেবার জন্য বিভিন্ন

সিনেমা দেখিয়ে ও হাসির গল্প শুনিয়ে আনন্দ দেবার চেষ্টা করেছি। তারাও প্রত্যেক রবিবার আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। তাদের সুরক্ষার কথা ভেবে বৃদ্ধাশ্রমে চাল, ডাল, নুন, তেল সয়াবিন ইত্যাদির সাথে মাস্ক, স্যানিটাইজার, দশটি রুম স্যানিটাইজার তুলে দিয়েছি।

আশা রাখি ভবিষ্যতে এই দূরবস্থা থেকে আমরা সবাই পরিত্রাণ পাবো। আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আমি এই অসহায়, অনাথ, নিরন্ন মানুষগুলির দিকে যে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছি তা যেন চিরকাল বজায় রাখতে পারি। ভবিষ্যতে আমার নিজের পড়াশুনা এগিয়ে নিয়ে যাবার সাথে সাথে এই ‘বন্ধু’সংগঠন কে আর বড়ো করে অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর সঙ্কল্প নিলাম।

অর্পিতা মন্ডল
দর্শন বিভাগ
দ্বিতীয় সেমেস্টার

অজানা মহামারী

Montana আমেরিকার একটি ছোট্ট শহর। ডেভিড এই শহরেরই বাসিন্দা। ডেভিড পেশায় ছিল চিকিৎসক, প্রত্যহের মতো আজও সে কাজে বেরিয়ে পড়ল। ডেভিড কিছুটা পথ গিয়ে তার সহপাঠী ও প্রেমিকা এলিনা গ্রান্ডেকে তার গাড়িতে তুলে নিল। গত রাতে এলিনা ও ডেভিডের বিয়ের তারিখ ঠিক হয়েছে, ৬ জুন তারা তাদের নতুন জীবনে পা রাখবে। তাই দুজনে খুব খুশি। গাড়ি চালাতে চালাতে ডেভিড দেখল কিছুটা দুরে একটি বাচ্চা মেয়ে একগুচ্ছ গোলাপ বিক্রি করছে। ডেভিড মেয়েটির কাছে গিয়ে গাড়িটা থামাল, মেয়েটিকে ২০০টাকা দিয়ে গোলাপ গুচ্ছটি কিনে নিল। মেয়েটি আনন্দিত হল এবং তাদের শুভকামনা জানিয়ে তার পথে সে চলে গেল। ডেভিড ফুলগুচ্ছটি এলিনার হাতে তুলে দিলে, এলিনা খুশি হয়ে লজ্জার সুরে ডেভিডকে ধন্যবাদ জানাল, ডেভিড মুচকি হেসে গাড়ি চালু করল। হাসপাতালে ঢুকতে না ঢুকতেই দুজনেই গাড়ি থামিয়ে একটু বিস্মিত হল। আজ হাসপাতালে নার্স, ডাক্তার, কর্মচারীরা সবাই কেমন যেন আতঙ্কিত হয়ে এদিক ওদিক দৌড়চ্ছে। ডেভিড গাড়িটাকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে রাখল। কোথায় যেন তাদের আনন্দের মুহূর্তটা এক নিমেষে হারিয়ে গেল। দুজনে তড়িঘড়ি করে হাসপাতালের অভ্যন্তরে গেল, যেতে যেতে সামনেই একজন নার্সকে ডেভিড জিজ্ঞেস করল তার আতঙ্কের কি? নার্স আতঙ্কিত হয়ে জানাল যে, চিন থেকে যে অজানা মহামারী সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে সেই মহামারীতে আক্রান্ত এক রুগীকে এই হাসপাতালে

ভর্তি নেওয়া হবে কি হবেনা তা নিয়ে হাসপাতালে এত বিষন্নতা ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। একথা শোনা মাত্রই ডেভিড ও এলিনা ছুটে গেল রুগীর কাছে। হাসপাতালে একটি বসার চেয়ারে ওই রুগী মুচড়ে বসে আছে, তার স্ত্রী ও মা অন্যান্য ডাক্তার ও নার্সের পায়ে হাতে ধরছে তাকে ভর্তি নেওয়ার জন্য, কিন্তু কেউই তাদের ধারে কাছে ঘেঁষতে চাইছে না। ডেভিড কে দেখে রুগীর মা সেলিনা জেনি ডেভিডের পায়ের কাছে বসে কান্নায় ভেঙে পড়ল। সেলিনা তার ছেলে ইমানুয়েল কে চিকিৎসা করার জন্য ডেভিডের কাছে অনুরোধ জানাল। ডেভিড ও এলিনা নিজেদের দায়িত্বে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কে জানিয়ে ইমানুয়েল কে ভর্তি করিয়ে নিল। ইমানুয়েলের স্ত্রী ও মা ডেভিড ও এলিনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাল। তারা তাঁদের চিকিৎসার আশ্বাস দিয়ে প্রস্থান করল।

সমস্ত নার্স, কর্মচারী, চিকিৎসক কে নিয়ে হাসপাতালে আলোচনা হল। মিটিং এ ঠিক হল এখন থেকে সবাই হাসপাতালে মাস্ক, পি.পি.ই কিট ও সেনিটাইজার ব্যবহার করবে, হাতগ্লাভস ও হ্যান্ডওয়াশ তো আগে থেকেই ব্যবহার হত। আর ইমানুয়েল কে সারিয়ে তোলার দায়িত্ব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর নির্দেশ অনুযায়ী ডেভিড ও এলিনাকেই দেওয়া হল।

তার পর তারা দুজনে তড়িঘড়ি করে ইমানুয়েলের চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা নিতে চলে গেল। পি.পি.ই কিট, মাস্ক, সেনিটাইসার লাগিয়ে গ্লাভস পড়ে দুজন

ইমানুয়েলের রুমে গেল। ইমানুয়েল জ্বরে কাঁপছে, তার চোখ মুখ কাশতে কাশতে লাল হয়ে গেছে, সে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। তাড়াতাড়ি করে এলিনা তাকে অক্সিজেনের মাস্কটা পরিয়ে দেয়। ডেভিড ইমানুয়েলের জন্য পি.পি.ই কিট, কিছু জ্বর কমার ঔষধ, এবং সাথে আরও বেশ কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও ইঞ্জেকশন

এর ব্যবস্থা করল। আর একবার পরীক্ষা করার জন্য ডেভিড ইমানুয়েলের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করল। এরপর এইভাবেই নানান চিকিৎসার মধ্য দিয়েই কেটে গেল আরো দুই দিন। পরের দিন ডেভিড ইমানুয়েলের রিপোর্ট দেখল, দেখেই ডেভিড একটু বিচলিত হলো। এলিনা ডেভিডকে বিচলিত হতে দেখে এক গ্লাস জল খেতে দিলো। তারপর ডেভিড কে তার বিচলিত হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলো। ডেভিড মৃদুস্বরে বলে উঠল 'করোনা পজেটিভ' ডেভিড মৃদুস্বরে বলে উঠল, করোনা পজেটিভ এই রোগীর বাকী সব রিপোটও যথেষ্ট উদ্বেগ জনক। এলিনা শুনে একটু বিচলিত হলেও পরমুহূর্তে ডেভিডের হাতে হাত রেখে সে তার মনে সাহস যোগায়। এইভাবে কেটে গেল কিছু দিন ডেভিড এলিনা তাদের বিবাহের ব্যাপারটা পুরো পুরি ভুলে গেছে বললেই চলে।

হঠাৎ একদিন হাসপাতালের বাইরে খুব চিৎকার, চ্যাঁচামেচির আওয়াজ শুনে ডেভিড এলিনা বাইরে বেরিয়ে আসে। এম্বুলেন্স এর পর এম্বুলেন্স ঢুকছে হাসপাতালে আর সব গুলোতেই আসছে কোভিড আক্রান্ত রুগী। সবাইকে হাসপাতালে ভর্তি করা হোল। ইমানুয়েলের মত একইভাবে সবার চিকিৎসা শুরু হোল। যতই দিন বাড়তে থাকলো হাসপাতালে মহামারীতে আক্রান্ত রুগীর সংখ্যাও ততই বাড়তে থাকল। ডেভিড ও এলিনার সঙ্গে অন্যান্য চিকিৎসকরাও চিকিৎসার জন্য নিজেদের হাত বাড়িয়ে দিল।

এর মধ্যেই ইমানুয়েল সুস্থ হতে শুরু করলে ডেভিড ও এলিনা এতদিনে একটা আশার আলো খুঁজে পায়। কিছুদিনের মধ্যেই ইমানুয়েল পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যায়। তার মা, বাবা, ও স্ত্রী তাকে ডিসচার্জ করিয়ে বাড়ি নিয়ে যায়। কিন্তু দিনে দিনে মহামারীতে আক্রান্ত রুগীর সংখ্যা আরও দ্বিগুণ হতে থাকে। ডেভিড এলিনা সহ অন্যান্য ডাক্তার ও নার্সরা একই ভাবে চিকিৎসা চালিয়ে যায়।

এইভাবে ব্যস্ততার সঙ্গে কেটে গেল একমাস, এরমধ্যেই ডেভিড এলিনা আরও ৫০ জন রুগীকে সুস্থ করে তুলেছিল। পরের মাসের ৬ তারিখে দুজনের বিয়ে, তাই তাদের বাড়িতে ইতিমধ্যেই খুব ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। ডেভিড এলিনা যেন আবার একটা অবসর পেয়েছিল তাদের ব্যক্তিগত জীবনে ফিরে

আসার। দুজনে একসাথে আবারও কিছু আনন্দের মুহূর্ত কাটালো তাদের ব্যস্ততা পূর্ণ জীবনকে এড়িয়ে।

২০ শে মে রাত্রিবেলা এলিনার খুব জ্বর এলো। এলিনা জ্বরে কাঁপতে শুরু করলো। বাড়িতে ভয় ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। এলিনার মা ডেভিডকে ফোনের মাধ্যমে সবকিছু জানালেন। ডেভিড একমুহূর্তও অপেক্ষা না করে তৎক্ষণাৎ গাড়ি নিয়ে এলিনার বাড়িতে এলো। এলিনা তার ঘরে শুয়ে জ্বরে কাঁপছে। তার গায়ে জড়ানো রয়েছে কিছু গা গরম করা কম্বল। এলিনাকে দেখে ডেভিড কান্নায় ভেঙে পড়ল। ইতিমধ্যেই ডেভিডের বাড়ির কয়েকজন এলিনার বাড়িতে চলে এল। ডেভিড এলিনার কাছে গেল, তাকে দেখে এলিনার চোখ জলে ভরে গেছিল। ডেভিড এলিনার চোখের জল মুছিয়ে দিল এবং তাকে সুস্থ হয়ে যাওয়ারও আশ্বাস দিল, কারণ আর কিছু দিনের মধ্যেই তারা দুজনে এক নতুন জীবনে পা রাখতে চলেছিল। ডেভিড এলিনার হাতটা শক্ত করে ধরলো, এবং দেখল এলিনার ঠোঁটের কোনে হালকা মুচকি হাসি। তারপর ডেভিড এলিনাকে জ্বর কমার কিছু ঔষধ ও ইঞ্জেকশন দিলো। এলিনা ঘুমিয়ে পড়লে ডেভিড বাড়ির সবাইকে শান্ত করিয়ে নিজেদের রুমে পাঠিয়ে দিল। ডেভিড এলিনার হাত শক্ত করে ধরে তার পাশে বসে পড়লো। বসতে বসতে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়লো তা সে টের পেল না। পরেরদিন সকালে ডেভিড এলিনার রক্ত নিয়ে গেলো পরীক্ষা করার জন্য। দুই দিন পর রিপোর্ট এলে রিপোর্ট দেখে ডেভিড কান্নায় ভেঙে পড়ল। বাড়ির সবাই ডেভিড কে দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ডেভিডের মা ডেভিডকে রিপোর্টের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে ডেভিড কাঁদতে কাঁদতে উত্তর দেয় 'পজেটিভ'। এলিনাকে ততৎক্ষণাৎ হাসপাতালে ভর্তি করানো হলো। এলিনার আত্মীয় স্বজন ও বাড়ির সবাইকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হলো। ডেভিডের বাড়ির সবাইকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হলো। দিনে দিনে এলিনার আবস্থা আরও খারাপ হতে থাকলো। ডেভিডও খুব ভেঙে পড়ল। ২৮ তারিখ রাত্রে ডেভিডও এই ভয়াবহ মহামারীর কবলে পড়ল। ডেভিডকে এলিনার রুমে পাশের বেডে রাখা হলো। হাসপাতালের সমস্ত ডাক্তার, নার্স ও

কর্মচারীরা ডেভিড ও এলিনার এই অবস্থা দেখে ভেঙে পড়ল। যারা সেই প্রথম থেকে এই মহামারীর সঙ্গে লড়াই করে চলেছে তারাই আজ সেই মহামারীর কবলে। দেখতে দেখতে চলে এল ৬ জুন ডেভিড এলিনার বিয়ের দিন। যেদিন বাড়িতে হই হুল্লোড় হওয়ার কথা সেই দিন ডেভিড এলিনার বাড়িতে আতঙ্ক ও বিষন্নতা,ভয়, ছড়িয়ে রয়েছে। ডেভিড ও এলিনা আগের থেকে আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। দিন শেষে রাত্রি নামলো, ডেভিডের মনে পড়ে গেল 'আজ তো তার ও এলিনার বিয়ের দিন। এই দিনটি নিয়ে তারা তো কত স্বপ্ন দেখেছিল। ডেভিড নার্সকে ইঙ্গিত করে বলল তাদের দুজনকে পি.পি.ই কিট -এর ভেতর থেকে বাইরে বের করতে। ডেভিড এলিনাকে কাঁদতে কাঁদতে বলল, “মনে আছে আজ আমাদের বিয়ের দিন”। ডেভিডের কথা শুনে এলিনার চোখ জলে ভরে গেল। দেখতে দেখতে ঘড়ির কাঁটায় সাতটা বাজলো। ডেভিড এলিনার হাত শক্ত করে ধরল খোলা জানালার বাইরে তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে নতুন স্বপ্ন দেখতে দেখতে ডেভিড এলিনা অজানা আর এক জগতে পা রাখল। ডেভিড, এলিনার মৃত্যুর পর তাদের অসীম অবদানের জন্য সরকারের তরফ থেকে তাদের জাতীয় সম্মানে সম্মানীত করা হলো। এই ভাবেই ডেভিড এলিনা হাজার হাজার মানুষের মনের মধ্যেই বেঁচে রইল। শুধু ডেভিড এলিনা নয়, ডেভিড ও এলিনার মতো সারা বিশ্বে এখন অসংখ্য ডাক্তার, নার্স, সবাই এই ভয়াবহ মহামারীর সঙ্গে লড়াই করে চলেছে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে রক্ষার তাগিদে। মানবজাতির সেই সকল সেবকদের আমি কুর্নিশ জানাই।

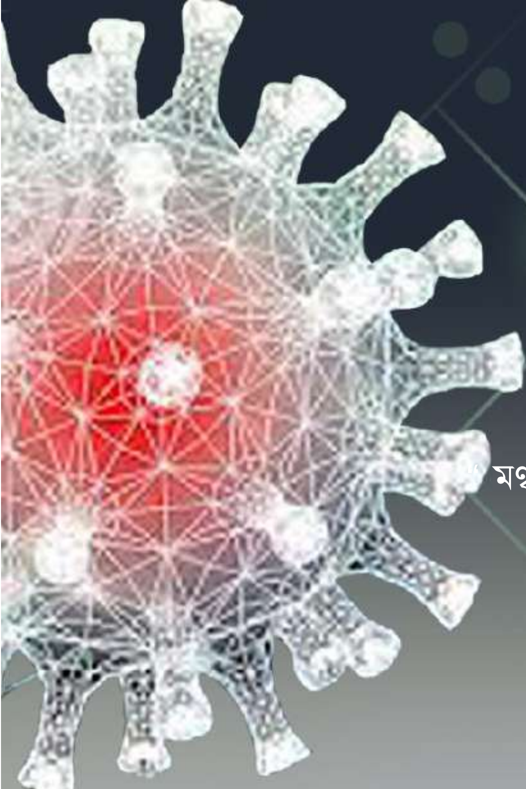

সৃষ্টি সাহা ও রিয়া সেনগুপ্ত
দর্শন বিভাগ
দ্বিতীয় সেমেস্টার

মহামারী করোনা ভাইরাস

"মণ্বন্তরে মরিনি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি"

বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, মহামারী মানুষের জীবনের সঙ্গে নানা ভাবে জড়িয়ে আছে। প্রকৃতি মানুষের হাতের মুঠোয় আবদ্ধ নয়। সে তার খেয়াল খুশি অনুসারে চলে। সেক্ষেত্রে বিজ্ঞান প্রযুক্তি কোন কাজে আসে না। শোনা যায় শুধু অসহায় মানুষের আর্তনাদ। যে প্রকৃতি সৃষ্টির আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সেই প্রকৃতি মেতে ওঠে মারণ রোগে। এই ধ্বংসকারী রূপের আরেক নাম মহামারী। আর এবার এই দানবী রূপের চেহারা বিশ্ববাসীর কাছে করোনা ভাইরাস রূপে ধরা পড়েছে। করোনা ভাইরাস বা COVID-19 কী? এটি হলো সদ্য আবিষ্কৃত এক ধরনের ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট রোগ। অনুমান করা হয় এটি সম্ভবত বাদুড় থেকে অন্য প্রাণীর যেমন - সিভেট বিড়ালের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। যদিও করোনা ভাইরাসের অনেক প্রজাতি আছে, তার মধ্যে মাত্র সাতটি প্রজাতি মানুষের দেহে রোগ সংক্রমণ করতে পারে। এদের মধ্যে চারটি সারাবছর ধরে সাধারণ হাঁচি, কাশি, সর্দির উপসর্গ রোগ সৃষ্টি করে। এরাহলো 229E(আলফা করোনা ভাইরাস), NL63(আলফা করোনা ভাইরাস), OC43(বিটা করোনা ভাইরাস), HKU1(বিটা করোনা ভাইরাস), এছাড়াও SARSCOV(সার্স কভ) এটি একটি করোনা ভাইরাস যা ২০০২ সালে প্রথম চীন দেশে দেখা দিয়েছিল। এর ফলে প্রায় মৃত্যুর হার ছিল ১০০ রোগী পিছু ১০ জন। সব মিলিয়ে মোট ৮,০০০ জনের কাছাকাছি আক্রান্ত হয়েছিল এবং ৮০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। গবেষণায় প্রমাণ হয় যে এক ধরনের গন্ধগোকুল প্রজাতির প্রাণী থেকে এই ভাইরাসটি

মানুষের শরীরে প্রবেশ করেছিল। আবার ২০১২ সালে সৌদি আরবে কিছু মানুষের মধ্যে এই রোগ সংক্রমিত হয়। যার ফলে বহু মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল। পরীক্ষা করে দেখা গেছে ভাইরাসটির তিনটি উপাদান আছে। প্রথমটি হলো ভাইরাসটির সবচেয়ে বাইরের অংশে থাকে গ্লাইকোপ্রোটিন-এর স্পাইক কাঁটা যেগুলোর সাহায্যে ভাইরাসটি জীবন্ত কোষে আটকে গিয়ে সংক্রমিত হয়। দ্বিতীয় উপাদান টি হল রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা আর.এন.এ(RNA) এরা জীবন্ত কোষের ভিতরে প্রবেশ করে ভাইরাসটির আর.এন.এ প্রতিলিপি তৈরি করে বংশবিস্তার করে। আর তৃতীয় উপাদানটি হল একটি লিপিড স্তর। এটা ভাইরাসের অন্যান্য অংশকে ধরে রাখে। এই তিনটি অংশের জন্য করোনা ভাইরাসের প্রকোপ মারাত্মক।

করোনা ভাইরাসকে একটা অপরিবর্তনশীল রোগ ভাবলে চলবে না। যেকোনো আর.এন.এ(RNA) ভাইরাসের মতো করোনা ভাইরাসও খুব সহজে

তার গঠন বদলাতে সক্ষম হয়। এই গঠন পরিবর্তনের ফলেই ভাইরাসটি অতি সহজেই এক মানব দেহ থেকে অন্য মানব দেহে সংক্রমিত হতে পারে। WHO কোভিড-19 কে একটি অতিমারি হিসাবে ঘোষণা করেছেন। পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই রোগের লক্ষণ গুলি হল মূলত জ্বর, সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্ট। এইসব লক্ষণ গুলি সাধারণত আক্রান্ত হওয়ার ২ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে প্রকাশ পায়। এই রোগটি আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত অতি সূক্ষ্ম জলের কণা বা ড্রপ্লেট-এর মাধ্যমে এটি অন্য ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করে। কোন ব্যক্তি যদি ভাইরাস লেগে থাকা এমন কোন জিনিস স্পর্শ করেন এবং সেই হাতটি নিজের চোখে, মুখে বা নাকে দেন তাহলে ওই ব্যক্তির আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেকোনো বয়সের মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। তবে ৭০বছরের বেশি বয়সী লোকের ক্ষেত্রে এই রোগের মৃত্যুর হার অধিক। RT-PCR টেস্টের মাধ্যমে এই ভাইরাসকে শনাক্ত করা যায়। এই ভাইরাসটির কারণে প্রতিনিয়ত হাজার হাজার মানুষ

মৃত্যুর সম্মুখীন হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে প্রায় ১০০বার মিউটেশন লক্ষ্য করা গেছে। সেখানে দেখা গেছে বারবার মিউটেশনের ফলে ভাইরাসটি খুব সহজেই নতুন নতুন পরিবেশে ও পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে সংক্রমণ ছড়াতে সক্ষম হচ্ছে। কিন্তু এই মিউটেশনের প্রভাবে কোভিড-19 যুক্ত রোগীদের উপসর্গে কি পরিবর্তন হচ্ছে তা এখনই বলা সম্ভব নয়। তার জন্য প্রচুর নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে।

এই রোগের সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা প্রণালী এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। আন্তর্জাতিক ভাবে বহু প্রতিষ্ঠান ও ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিতে টিকা আবিষ্কারের চেষ্টা ও বিভিন্ন ক্লিনিকালে ট্রায়াল শুরু হয়েছে। তবুও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য ও সুস্থতার লক্ষ্যে। WHO-এর নির্দেশিকা অনুযায়ী অ্যালকোহল যুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার অথবা সাবান জল দিয়ে ঘন ঘন ও ভালো ভাবে হাত ধুলে এই রোগটির সংক্রমনের সম্ভাবনা কমে যায়। তাই সাবান দিয়ে হাত নির্দিষ্ট সময় অন্তর ধোয়া বা অ্যালকোহলযুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা, মাস্কের ব্যবহার করা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, চোখে, মুখে, নাকে হাত দেওয়া থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি অনুশীলন করা।

এই মারণ ভাইরাসের ফলে গোটা পৃথিবী আজ থমকে গেছে। প্রতিদিনের চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা, স্কুল কলেজ বন্ধ, ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা। এইসব কারণে পৃথিবী আজ স্তব্ধতায় পূর্ণ। সমগ্র বিশ্বে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, স্পেন, চীন, ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারতসহ বিশ্বের ২১৩ টিরও বেশি দেশের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব বিদ্যমান। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ও মৃত্যু হয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। আমেরিকায় মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ অতিক্রম করেছে। সমগ্র বিশ্বে মৃত্যুর হার আরও ভয়ংকর। আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৭০ লক্ষ। রোগ প্রতিরোধ কল্পে বিভিন্ন দেশ জারি করেছে লকডাউন। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও স্বাস্থ্যের সংকট দেখা দিয়েছে। পৃথিবীকে যেন এক দুর্ভিক্ষ গ্রাস করেছে। ভারতে প্রথম কোভিড-19 এর

প্রভাবে ১২ই মার্চ মৃত্যু হয় কর্নাটকের এক বাসিন্দা এবং তারপর থেকেই শুরু হয় এর প্রকোপ। সরকার এর প্রতিবিধান কল্পে ২৪শে মার্চ প্রথম দেশব্যাপী লকডাউন জারি করেন ২১ দিনের জন্য। তারপর বারবার সময়সীমা বাড়ানো হয় মে এবং পঞ্চম পর্যায়ে ১লা জুন পর্যন্ত বলবৎ করা হয়। এবং জুন থেকে আনলক-I,II,III -এর মাধ্যমে আবার স্বাভাবিক পরিস্থিতির দিকে ফেরানোর চেষ্টা করছে সরকার। এই সময় ভারতে বন্ধ ছিল রেলপথ, মেট্রো পরিষেবা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সিনেমাহল, মল, জনসমাবেশ, অফিস সবকিছু। এই সময় সবচেয়ে দেশি বিপদে পড়েছিল পরিযায়ী শ্রমিকেরা। দিন আনা দিন খাওয়া মানুষদের অবস্থা ছিল চরমে। স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরিবহন সবই ছিল ব্যাহত। এরই মাঝে আম্ফান ও নিসর্গ ঝড় বিপর্যস্ত করেছে সমগ্র ভারতবাসীকে। ভারতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ২৮ লক্ষ অতিক্রম করেছে। আর মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ৪৮ হাজার এবং সুস্থ হয়েছে প্রায় ১৭,৫১,৫৫৫ জন।

এভাবেই করোনা শিখিয়েছে মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব হলেও প্রকৃতির কাছে আজও সে নিতান্ত অসহায়। তার ভয়াল গ্রাসে চলমান পৃথিবী হয়েছে স্তব্ধ, ক্ষুধার্থ শিশু মায়ের কোলে ঘুমিয়েছে অশ্রুসিক্ত নয়নে, বহু মানুষ হয়েছে স্বজনহারা। নানা অভাবে রিক্ত সমগ্র পৃথিবী। অর্থনীতির সংকটে জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি, কাজ হারা শ্রমিকের চোখের জল, কৃষকের দুর্দশার মধ্যেই পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে করোনার অভিশাপ। সবাই করোনা মুক্ত ভবিষ্যতের অপেক্ষয় দিন গুনছে।

"আমাদের দেখা হোক বিজ্ঞান জিতলে
আমাদের দেখা হোক মৃত্যু হেরে গেলে
আমাদের দেখা হোক সুস্থ শহরে।"

অরুমিতা চক্রবর্তী
দর্শন বিভাগ
দ্বিতীয় সেমেস্টার

করোনা আতঙ্ক ও সচেতনতা

ভয়ঙ্কর এই করোনা ভাইরাস যা নিয়ে আমরা আজ রীতিমতো উদ্বিগ্ন তার আবির্ভাব চীনে, সেখান থেকে ক্রমশ ছড়াতে ছড়াতে সমগ্র বিশ্বে এই কোভিড নাইনটিন মারণ ভাইরাসটি দ্রুত সংক্রামিত হয়ে পড়েছে। যারা শুরু থেকে প্রচন্ড সচেতনতার সঙ্গে এই অতীমারীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পেরেছে, তারা তবু কিছুটা নিরাপদ জায়গায় আছে। ভারতবর্ষে করোনা আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে। ২০২০ র অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫ লক্ষ ২৬ হাজার ১৯৩ জন।আজ বিশ্বের প্রতিটি মানুষের প্রতিটা মুহূর্ত যেন কাটছে এই ভয়ঙ্কর আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে।

করোনা এমন একটা শব্দ যা বর্তমানে প্রতিটি মানুষকে বিব্রত করে তুলেছে। প্রতিটা মুহূর্তে আমরা শঙ্কিত হই এই ভেবে এই বোধ হয় আমিও করোনার থাবা থেকে রেহাই পেলাম না। আমি ব্যক্তিগত ভাবে একটা কথা বলতে পারি প্রত্যেকের মধ্যে যদি সচেতনতা আসে তাহলে আমরা কোভিড নাইনটিন থেকে দূরে থাকতে পারবো। সরকার থেকে এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র থেকে আমাদের সচেতন করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা কি তা আদৌ মেনে

চলছি? যদি ঠিকঠাক আমরা সবাই মেনে চলতাম তাহলে এই করোনা কিন্তু এইভাবে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়তো না।

করোনায় আক্রান্ত হলে আইসোলেশন বা কোয়ারেন্টাইন এই ব্যবস্থা গুলি অনুসরণ করতে হবে আর ডাক্তার, হাসপাতাল তো আছেই কিন্তু তার আগে আমরা একটু সচেতন হতে পারি না? বারবার হাত ধোয়া ,হাত স্যানিটাইজ করা, নাক মুখ ঢেকে রাখা কিংবা বিধিসম্মত মাস্ক ব্যবহার করা এসব তো

সুকন্যা মিত্র

আমরা করতেই পারি। তবে এইসব করলেই যে করোনা থাবা বসাবে না সেটা আমি বলছিনা, কিন্তু সাবধানতা সচেতনতা এগুলো তো আমাদের নিজস্ব ব্যাপার। ভিটামিন সি জাতীয় (অ্যাসকরবিক অ্যাসিড) খাদ্য গ্রহণ করলে কিছুটা সুস্থ থাকতে পারি আমরা। তবে সবচেয়ে বড় কথা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা। আমি যদি নিজেকে পরিষ্কার রাখতে পারি তাহলে সেইসঙ্গে আমরা বাড়ি এবং আমাদের পরিবারের সকলের মধ্যে এই সচেতনতা এনে দিতে পারি। তাহলে আমার মনে হয় নিজেকে বা নিজেদের অনেকটা নিরাপদ বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ করতে পারব।

যেখানে সেখানে থুথু ফেলা আমাদের বন্ধ করতেই হবে। এতে আমি আমার পরিবেশ কে নষ্ট করছি। আমি যদি আমার পরিবেশকে স্বচ্ছতা দিতে পারি তাহলে বুঝতে পারব করোনার বিরুদ্ধে আমার লড়াই চলছে। এইভাবে পরিবেশে প্রতিটি মানুষ সচেতন হতে পারে। তাহলে প্রত্যেকেই আশা করি

নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারবে। আর করোনার মত ভয়ঙ্কর ব্যাধিকে দূরে ঠেলে দিতে পারবে।

সবচেয়ে বড় কথা, শুধু করোনা বলেই নয় যে কোন রোগের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে নিজের স্বচ্ছতা এবং সচেতনতা সবচেয়ে জরুরি এটা মানতেই হবে। নতুবা করোনার মতো ভয়ঙ্কর মহামারী কে আমরা আহ্বান করে ঘরের শয়ন কক্ষ পর্যন্ত টেনে আনতে পারি। সেটা নিশ্চয়ই সমাজের জন্য কল্যাণকর হবে না। শরীর আছে যখন রোগ ব্যাধি এইসব তো থাকবেই, যেটা আমাদের করা উচিত তা হল রোগের বিরুদ্ধে লড়তে হবে স্বচ্ছতার সঙ্গে এবং অবশ্যই সরকারি নিয়মনীতি মেনে। তাহলেই আমরা আগামী দিনে উজ্জ্বল সূর্য কে দেখতে পাবো এবং প্রকৃতির মধ্যে থেকে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারব। তবু ভয় পেলে চলবে না, হেরে যেতে আমরা শিখিনি। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে যায়:-

“তমোসো মা জ্যোতির্গময়ঃ”

আমরা আলোর পথ খুঁজে পাবই। আজ হয়তো আমাদের সকলের জীবনে তমসা নেমে এসেছে কিন্তু তার বিপরীতে রয়েছে প্রদীপের উজ্জ্বল দীপশিখা। আবার আমরা নতুন পথ খুঁজে পাবো এবং আশা করি সেই দিন আর বেশি দূরে নেই যেদিন এই মারণ রোগের টীকা আবিষ্কৃত হবে এবং নতুন সূর্যের উদ্ভাসিত আলো সমগ্র পৃথিবীকে রাঙিয়ে দিতে পারবে।

ময়ূরী দেবনাথ
দর্শন বিভাগ
দ্বিতীয় সেমেস্টার

হাত বাড়াও

"বাবা আমি আসছি" এই বলে গোপাল (কাপড় দিয়ে ঢাকা) খাবারের পাত্র হাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাটির রাস্তা ধরে হেঁটে যেতে লাগলো। হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়লো, মন্দিরের সামনের বড়ো উঠোনটায় বাচ্চারা খেলা করছে, গোপাল কিছুটা তন্ময়তার সাথে ওই দিকে তাকিয়ে রইলো। ওর বন্ধুদের সাথে খেলার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তবুও মনের মধ্যে বিষণ্ণভাব নিয়ে গোপাল আবার মাটির রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলো। এবার গোপালের চোখে পড়লো রাস্তার পাশে হয়ে থাকা আম, জাম, কাঁঠাল, নারকেল নানান গাছে, আবার নানান রকমের ফুল গাছ, তার মধ্যে আছে লাল জবা, সাদা টগর, সাদা বেল ও জুঁই ফুল আর এই ফুলের সুগন্ধে গোপালের বুকটা ভরে গেল। আর সূর্যের আলোয় এরা যেন আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির এরূপ সৌন্দর্যের মধ্যে ওর মনের বিষণ্ণতা অদ্ভুতভাবে হারিয়ে গেল। যে উদ্দেশ্যে গোপাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল এবার সেখানে এসে উপস্থিত হল। নদী থেকে স্বল্প দূরে অন্যের জমিতে ওর মা কাজ করছে। তাই গোপাল তার মা- এর জন্য সকালের খাবার (পান্তা) নিয়ে এসেছে। বাড়ি ফিরে গোপাল দেখলো ওর বাবা দেওয়াল ধরে হাঁটার চেষ্টা করছে ও ছুটে গিয়ে বাবার হাতটা ধরলো।

সমগ্র বিশ্ব কোভিড-১৯ এর করাল গ্রাসে জর্জরিত। এছাড়াও দঃ২৪পরগণার ওপর আছড়ে পড়া আমফান ঘূর্ণিঝড়ের ফলে অনেক এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। সে রকমই একটি ক্ষতিগ্রস্ত জায়গা হল সুন্দরবন অঞ্চলের গোসাবা এলাকার অন্তগর্ত সূর্যবেড়ে

গ্রাম। নয় বছর বয়সী গোপাল ও তার মা-বাবা এই গ্রামের বাসিন্দা। প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে নদীর বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় নদীর জল স্থানীয় এলাকা ও চাষের জমিতে ঢুকে পড়ে। এর ফলে চাষের জমির সমস্ত ফসল নদীর নোনা জলে নষ্ট হয়ে যায়, বহু মানুষের ঘর-বাড়ি ভেঙে পড়ে, পালিত হাঁস-মুরগী ও পুকুরের মাছ মারা যায়, নানান গাছ-পালা ভেঙে পড়ে, সবোর্পরি পানীয় জলের সমস্যা এতটাই সংকটময় হয়ে ওঠে যে, গ্রামবাসী বাধ্য হয় পুকুরের জল ফুটিয়ে খেতে। এক কথায় গোপালের মনে হওয়া রূপকথার মতো গ্রাম প্রায় ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়।

অন্যদিকে কোভিড-১৯ এর কারণে দেশ জুড়ে লকডাউন প্রক্রিয়া শুরু হয়। আর এই লকডাউন এর ফলে কাজ হারায় বহু শ্রমিক ও চাষি, আবার যাদের জীবিকা দিনমজুরী তাদের জীবন প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেছে। আমাদের দেশের প্রায় ২১.৯ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে। গোপালের পরিবার ও এই সীমার মধ্যে পড়ে। গোপালের বাবা অর্থাৎ রতন দাস পেশায় ভ্যান চালক। ভয়াবহ এই করোনা পরিস্থিতিতে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ সচেতন হওয়ার বদলে আতঙ্কিত। তাই কোন প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা অগ্রাহ্য করে শুধু মাত্র চোর সন্দেহের ভিত্তিতে ভ্যান চালক রতন দাসকে গ্রামের কিছু ক্ষমতাধীন ব্যক্তি মারধোর করেন। ঠিক একই সন্দেহের বশে গোপালেরও তার সহপাঠীদের সাথে মেলামেশা বন্ধ হয়ে যায়, এবং রতন দাস পায়ে ভীষণভাবে আঘাত পায়। আর এই আঘাত এতটাই পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে যে, তার বাবা আর আগের মতো পরিশ্রম করতে পারেন না। গোপালের মা অর্থাৎ গীতা দাস হলেন গ্রামের বধূ। গীতা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত নয়। তবে চাষ করা, সেলাই করা, ঘূনী তৈরি, আটোল বোনা, জাল দিয়ে মাছ ধরা – এমন অনেক কিছুই তার আয়ত্তের

মধ্যে। গোপাল শুনেছে দুর্গা মা দশ হস্ত দিয়ে অসুরদের থেকে তার সন্তানদের রক্ষা করেছিলেন। আর গোপাল মনে করে তার মায়ের ও এরূপ অদৃশ্য হাত আছে যার দ্বারা এতো কঠিন সময়ের মধ্যে তার মা এই পরিবারকে যত্নসহকারে আগলে রেখেছে।

এইভাবে কিছু দিন কেটে যায়। আবার দ্বিতীয় পর্যায়ের লকডাউন শুরু হয়। তাই সকলের মতো রতনকে ও ঘরবন্দী হয়ে থাকতে হয়। নিজস্ব পেশায় যুক্ত হওয়া সম্ভব হয় না। এদিকে সঞ্চিত অর্থ ও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। রতনের কাছে পরিস্থিতি ক্রমে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। প্রতিদিনের মতো সেদিন ও গোপাল তার বাবাকে জানিয়ে বের হয়েছিল। কিন্তু বেরিয়ে আসার সময় সে লক্ষ্য করলো শূন্য দৃষ্টিতে বাবা যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে, আর গভীর ভাবে কি যেন ভাবছে। আসলে রতনের শারীরিক ক্ষত কখন যে তার সমগ্র মনকে গ্রাস করে ফেলেছে, তা রতন কাউকে বুঝতে দেয়নি। আর ঘটে যায় সেই মর্মান্তিক ঘটনা। বাড়ি ফিরে গোপাল ও তার মা দেখতে পায় রতনের ঝুলন্ত দেহ। হৃদযন্ত্রের স্পন্দন থেমে যাওয়া বা 'মৃত্যু' এই কঠিন শব্দটার মানে গোপাল বোঝে না। গোপাল শুধু জানে ও আর কখনো তার বাবার হাত ধরতে পারবে না।

এটা শুধু মাত্র গোপাল ও তার মায়ের গল্প নয়। এরকম অগনিত গোপালের জীবন এমন দুর্বিষহ ঘটনায় স্তব্ধ হয়ে গেছে। আমাদের রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক হলেও জনগণের প্রয়োজনের তুলনায় নির্বাচনের সময় প্রশাসন কর্তাদের অধিক দর্শন মেলে, তা আমরা জানি। তবে আশ্চর্যের বিষয় হল- আমাদের এই সাধারণ জনগণের পাশাপাশি শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশ নাগরিকও খবরের কাগজ, সোশ্যাল মিডিয়া, এছাড়াও রাজনৈতিক মহলের ত্রুটি নিয়ে আলোচনা- সমালোচনায় মুখর হবে অথচ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটাই ভুলে যাবে যে, "আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ কর্তব্য করা উচিত" অর্থাৎ আমাদের মধ্যে থাকা ছোটো 'আমি' কে তুচ্ছ করে, 'আমরা বোধ' জাগ্রত করে, এই মানবজাতির কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

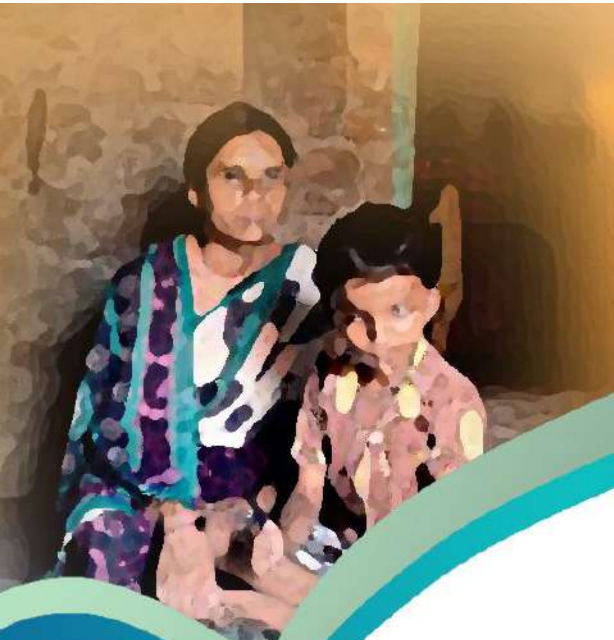

মনীষা হালদার
দর্শন বিভাগ
দ্বিতীয় সেমেস্টার

অনাহার

প্রত্যেকদিন ভোরবেলাতেই মৃত্যুঞ্জয় বেরিয়ে যায়। আজও একই রুটিন- পাঁচ থেকে ছয় কিমি হেঁটে একটা গ্রাম থেকে অপর গ্রাম পার হয় প্রত্যহ সে। তাই পাঁচ থেকে ছয় কিমি হাঁটা তার কাছে কিছুই নয়। কারণ তার এই মুহূর্তে বেঁচে থাকার একমাত্র জীবিকাই হল-একটা গ্রাম পার হয়ে অপর গ্রামে গিয়ে সবজি বিক্রি করা।

২০২০ সালে অজান্তে এক অতিমারির কবলে পড়ে বিশ্ববাসী। যার নাম "করোনা"। অতিমারির কবল থেকে বাঁচার জন্য দেশবাসী আরও একটা নিয়মের শিকার হয় "লকডাউন"। "লকডাউন" যার অর্থই হল আটকে থাকা। ভয়ংকর অতিমারি থেকে নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যই দেশবাসী চারদেওয়ালের গণ্ডিবদ্ধ জীবনে। গাড়ি-ঘোড়া, দোকান-বাজার, বিনোদনমূলক স্থান সবকিছুই বন্ধ হয়ে যায়। বিশ্বে নেমে আসে অন্ধকারের ছায়া। কাজ কর্ম হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণে হারিয়ে যায় অসংখ্য মানুষের জীবিকা, যার মধ্য মৃত্যুঞ্জয় একজন।

মৃত্যুঞ্জয়ের ঘরে স্ত্রী এবং একটি পাঁচ বছরের সন্তান রয়েছে। ছোটো টালির ঘর, বস্তি অঞ্চল। তারমাঝে কোনো রকমে তাদের সংসার। মৃত্যুঞ্জয়ের একমাত্র পেশাই যে সবজি বিক্রি করা তা নয়। সে ছিল রাজমিস্ত্রী। মুম্বাইতে রাজমিস্ত্রির কাজ করে বেতন পাঠাতো তার স্ত্রী সন্তানের জন্য। বেশ সুখী ছিল

তারা। কোনোরকমে দিন চললেও হতাশা কখনও তাঁদের স্পর্শ করেনি। মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে মৃত্যুঞ্জয় আসতো তাঁর সুখের ঘরে। ছেলের জন্য খেলার জিনিষ আনত। বাবা আর ছেলে সেক'দিন আনন্দে কাটাত। কিন্তু হঠাৎ করেই তাঁদের জীবনে অন্ধকার নেমে আসবে সে জানবে কেমন করে? করোনা অতিমারির কারণে লকডাউন হওয়াতে মৃত্যুঞ্জয় আটকে যায় মুম্বাইতে । এদিকে স্ত্রী সন্তান বাড়িতে না খেয়ে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে-এই ভাবনায় সে অস্থির হয়ে উঠেছে। না! এভাবে আর নয়। মৃত্যুঞ্জয়কে কিছু একটা করতেই হবে। কিন্তু কি করবে সে? ভাবতে ভাবতে মৃত্যুঞ্জয়ের মাথাই একটা চিন্তা খেলে গেলো। "হুম !!! এবার ঠিক বাঁচা যাবে"। নিজের গ্রামে ফিরে যাওয়া যাবে। ট্রেন, বাস, গাড়ি সবই অচল, তবুও বাড়ি ফিরতে তাকে হবেই। হেঁটেই বাড়ি ফিরতে হবে। গ্রামটা তো নেহাত কাছেই নয়! মুম্বাই থেকে মেদিনীপুর হেঁটে বাড়ি ফেরা? – এই সব কথা সে নিজের মনে মনে বলতে লাগল, আর সমাধানের রাস্তা খুঁজতে লাগল। প্রচলিত একটা কথাই আছে সেটাই তার মাথায় আসল যে, "ঠেলায় পড়লে গোরু গাছে ওঠে"। মৃত্যুঞ্জয়ের ক্ষেত্রেও তাই হল।

হাঁটা শুরু করলো মৃত্যুঞ্জয় এবং তার দলবল অর্থাৎ ছোটো খাটো সহকর্মীরা। একদিনে যতটা পারছে সবাই মিলে হাঁটছে, কিছু কিছু জায়গায় বিশ্রাম নিচ্ছে, আবার হাঁটা শুরু করছে। কিন্তু

শুধু তো হাঁটা নয়, খাবার, জল, ওষুধ সবকিছু চাই। একদিকে অসম্ভব রোদের তাপ, অন্যদিকে খাবার জলের অভাব। তবুও হাঁটছে সবাই। একে অপরকে সাহায্য করে চলছে। দিন হয়, আবার রাত। তারপর আবার দিন। এদিকে তাঁদের কাছে খাবার, জল সব শেষ। লকডাউনের ফলে সব বন্ধ। শুধু আছে মনের জোর। যেখানে এতটুকু জল পাওয়া যায়, সবাই মনভরে যতটা পারা যায় খায়, আর সঙ্গে নিয়ে নেয়। কিন্তু খাবার নেই। রাস্তায় পড়ে থাকা জিনিষও তারা কুড়িয়ে খেতে শুরু করে অনেকে। মজুদ রাখা সব টাকাও শেষ। না! ভাগ্যও তাদের সহায় দিলো না। কয়েকদিন এইভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে হাঁটার পর মাঝ রাস্তাতেই মৃত্যুঞ্জয়ের দলের কিছু লোক অসুস্থ হয়ে পড়ে। ভয়ানক পেটে যন্ত্রণা। অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে অনেকে। কোনও ওষুধও তখন কাজ করল না। চারিদিকে ঘন অন্ধকার আর সামনে শুধু রাস্তা। মানুষজন কোথাও নেই। ফলে মাঝরাস্তাতেই প্রাণ হারাতে হয় কিছু জনকে। লোকালয়ে থাকার কথা বললেও, মৃত্যুঞ্জয় পিছুপা হয় না। তার মনে এখনও জেদ। মাথায় তার বাড়ি ফেরার আগুন চেপে বসেছে। সে জয় করবেই!

অবশেষে মৃত্যুঞ্জয়ের কঠোর মনের জোর এবং সাহসের কারণেই পৌঁছাতে পেরেছে নিজের গ্রামে। যেদিন সে ফিরেছিল সেদিন তার পরিবারকে দেখে আনন্দে চোখের থেকে জল বেরিয়ে এসেছিল, যা অত কষ্টের মধ্যেও কোনদিন হয়নি। ছেলে আর বউকে নিয়ে শুরু হল তাঁর জীবন যুদ্ধের লড়াই।

টিঁকে থাকার লড়াই। সিদ্ধান্ত নিল এবার রাস্তায় নামবে সে অর্থ জোগাড় করতে। কিন্তু এখানে কাজ কোথায়? অতিমারির ভয়াল চেহারা বিশ্বকে একেবারে গ্রাস করে নিয়েছে। তার সাথে সাথে লকডাউন। কোনও জায়গায় কাজ নেই। কয়েকটা দিন সে কাজ খুঁজল। কারণ তাকে সংসার চালাতে, তিনটে পেট চালাতে হবে। কি করবে মৃত্যুঞ্জয়? এবারও সে ভাবতে ভাবতে উপায় বার করে ফেলল। সে গ্রামে মহাজনের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করে আনল সুদের বিনিময়ে। টাটকা সবজি কিনে পাঁচ কিলোমিটার দূরে দূরে পায়ে হেঁটে শহরের কাছে সবজি বিক্রি করতে শুরু করল। কয়েকদিন বিক্রি ভালোই হল। একটু একটু করে টাকা জমাতে শুরু করল সে। ধারের টাকা শোধ করতে হবে তাকে। কিছুদিন এভাবে চললেও ভাগ্য তার বিমুখ হয়। তখন রাস্তায় তার মত অনেকে নেমে পড়েছে সবজির ঝুড়ি নিয়ে। অনেক বিক্রেতা কিন্তু ক্রেতা নেই। সে আরও দূরে যেতে লাগল বিক্রির জন্য। চিৎকার করে বলতে লাগল- সবজি চাই, সবজি চাই, টাটকা সবজি। নেই! কেউ নেই। অবশেষে লোকশানে সে বিক্রি করতে লাগল পরের দিনের লাভের আশায়।... দিন এভাবে চলে যায়, কিন্তু তার সবজি বিক্রিতে লোকশানের বোঝা বাড়তে

থাকল। এদিকে মহাজনের টাকার পরিমাণ বাড়তে থাকল। সে আবার ভাবতে শুরু করল। জীবন যুদ্ধে সে টিঁকে থাকবেই। এই সময়কে হারাতে হবে। পরের দিন আবার ঝুড়ি নিয়ে বের হয় সে। রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে সে ভাবতে থাকে নতুন কোনও পথ। সে ভাবতে ভাবতে অন্য পথে অন্য রাস্তায় চলে গেল। ফলে সেদিন তার বিক্রি প্রায় একদমই হয় না। রাগে, অভিমানে সে বাড়ির দিকের পথ ধরে। পাশের গ্রামে অতি অল্প টাকায় সে সব সবজি একজনকে দিয়ে দেয়। যে টাকা পায় সে সেদিন নিজের বাড়ির জন্য বাজার করে আনে। সময়ের আগে বাড়ী ফেরায় ছেলে আর বাবা অনেক দিন পর আবার মজা করে খেলতে থাকে। বউ রান্না করতে থাকে। আজ সকলে একসঙ্গে খাবার খাবে। আজ মৃত্যুঞ্জয় সপরিবারে খাবে অনেকদিন পর। ভাত, ডাল, আলুমাখা এবং শাকভাজা। হঠাৎই হাজির মহাজন অর্থাৎ যার কাছ থেকে মৃত্যুঞ্জয় টাকা ধার নিয়েছিল।

এবারে মহাজনকে বুঝিয়ে ফিরিয়ে দিলেও মৃত্যুঞ্জয়ের মাথায় ধারের টাকা শোধ দেওয়ার বিষয়টা ঘুরতে থাকল। দুপুরের খাবার খেয়ে সে আজ পাশের ঘরে শুতে গেল। চোখ বন্ধ করে সে আবার ভাবতে শুরু করল। এবার যেন তার মনে আর কোন শক্তি নেই। কিছুই ভাবতে পারছে না। তার স্বপ্ন সব যেন সরে সরে যাছে। ছেলেকে বড় করার স্বপ্ন, ভালো ঘর বাঁধার স্বপ্ন-সব সব যেন ওলটপালট হয়ে যাছে। তার জীবনের স্বপ্ন ভেঙে চূরমার হয়ে যাছে। কিছুতেই মেনে নিতে পারছেনা সে। মনে মনে বিড়বিড় করে কথা বলে চলেছে সে। হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে কি যেন বলতে চাইছে সে। হচ্ছে না, কি যেন তার মিলছে না। জীবনের হিসাব তার সব উলটে পালটে যাছে। তবুও সে মেলাতে চেষ্টা করছে। এভাবে ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়ে। বিকেলে উঠে সে সোজা চলে যায় মাঠের পূর্ব কোণের দিকে যেখানে খরস্রোতা পিছাবণী নদী

বয়ে চলেছে। আমফাণে ঝড় জলের দাপটে নদী তখন যৌবনের তারুণ্যে উচ্ছল। দুচোখ ভরে দেখল মৃত্যঞ্জয়। বাড়ি চলে এল।

রাতে সকলের সঙ্গে খাবার খেল সে। ছেলে বাবাতে যে মজার সম্পর্ক তা যেন এক প্রহরে কোথায় মিলিয়ে গেল। আজ কোনও কথা বললনা মৃত্যঞ্জয়। পাশের ঘরে সোজা চলে গেল। ভাবতে চেষ্টা করল নিজের কথা, পরিবারের কথা। কিন্তু সে যেন কিছুই ভাবতে পারছে না। সে যেন জীবন যুদ্ধে পরাজিত সৈনিক। সারা ঘরে পায়চারি করতে লাগল আর বিড়বিড় করে কথা বলতে লাগল। ল্যাম্পের আলোয় কি যেন খুঁজতে শুরু করল। আলো নিয়ে পাশের ঘরে যেখানে তার বউ আর ছেলে ঘুমিয়ে আছে গভীর ঘুমে। ভাল করে তাদের দিকে তাকালো সে। কাউকে যেন চিনতে পারছেনা। ভালো করে দেখল একবার তারপর ফিরে এল নিজের ঘরে। তারপর কিছু না ভেবেই দৌড় লাগালো সে মাঠের পানে। যেখানে নদী তীব্র গতিতে বয়ে চলেছে। কিছু আর সে চিন্তা করতে পারছে না। একবার পিছনে তাকিয়ে ঝাঁপ দিল সে নদীর গর্ভে। কিছুক্ষণ পরে ভেসে উঠল তার মৃতদেহ। নদীর স্রোতে ভেসে গেল সে। ভোর হতেই পাশের গ্রাম থেকে উদ্ধার হল তাঁর মৃতদেহ। ভোর হতেই মৃত্যুঞ্জয়কে নিয়ে হৈ হুল্লোড় হতেই পুলিশকে খবর দেওয়া হল। তাঁরা এসে মৃত্যুঞ্জয়ের মৃতদেহকে সনাক্ত করে নিজের গ্রামে নিয়ে এল তাঁর বাড়িতে। হয়তো এটাই মৃত্যুঞ্জয়ের শেষ জয় ছিল।

মৃত্যঞ্জয়ের জীবনের লড়াই শেষ হল। ফেলে গেল তাঁর স্বপ্নের পরিবারকে। কিন্তু এ কাহিনী তো শুধু মৃত্যুঞ্জয়ের একা নয়। লকডাউনের কারণে এমন অনেক মৃত্যুঞ্জয় আছে যারা এমনই ভাবে কাজ হারিয়ে না খেয়ে, অভাব অনটনে নিজেই নিজের ওপরে হেরে যাচ্ছে প্রত্যেকটা মুহূর্তে। ফেলে যাচ্ছে তাদের স্বপ্নকে।

বিপাশা চ্যাটার্জী
দর্শন বিভাগ
দ্বিতীয় সেমেস্টার

আম্ফান-এর অভিজ্ঞতা

আম্ফানের অভিজ্ঞতা টা আমার জীবনে সব থেকে ভয়ের অভিজ্ঞতার মধ্যে অন্যতম। ১০০ বছরে দেখা সবচেয়ে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় যা শহর কলকাতা কে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। এই আম্ফান ঘূর্ণিঝড় টি পুরো বাংলার রূপ বদলে দিয়ে গেছিলো এবং সেই দৃশ্য একদমই ভোলার নয়। সময় টা খুবই খারাপ ছিল, কারণ আগে থেকেই করোনা ভাইরাসের কবলে পুরো বিশ্ব বন্দিদশায় ছিল।

আর ঠিক সেই সময় মে মাসের শেষের দিকে খবরে শোনা গেলো আম্ফান নামের একটি ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় বাংলার মাটি তে ধেয়ে আসতে পারে ১৫৫ কিমি/ঘণ্টা থেকে ১৬৫ কিমি/ ঘণ্টা তে। শুনে ততো টাও আশ্চর্য হইনি। কারণ বঙ্গোপসাগর থেকে আসা বেশিরভাগ ঝড় আমাদের কলকাতা তে আসার সাথে সাথে নিম্নচাপে পরিণত হয়, অতীতে আমরা বহুবার এমন টাই হতে দেখেছি। তবে সেই বিশ্বাস কে মিথ্যা প্রমাণ করে আমাদের বাংলার ব্যাপক ক্ষতি করতে এই ঝড় পুরোপুরি সক্ষম হয়, ও বাংলার মানুষের দুঃখের কারণ হয় ওঠে। এতটাই শক্তিশালী এবং মারাত্মক ছিল এই ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় যে এর জন্যে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে পূর্ব ভারতে, বিশেষ করে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে, এবং ২০২০ সালের এই ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশে ১৯৯৯ সালে ঘটে যাওয়া উড়িশ্যার ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের চেয়েও বেশি ক্ষতি এনেছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ পর্যালোচনার মাধ্যমে জাতীয় সঙ্কট পরিচালনা কমিটি এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা করতে বহু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন।

এই দুর্যোগ থেকে বাঁচতে মানুষ তখন রাজ্য সরকারের সাহায্যের হাত পাওয়ার আশায় ছিল এবং রাজ্য সরকার যথাযথ কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের কার্যক্রমের

সমন্বয় সাধন করে ও মানুষ কে আবার সব কিছু গুছিয়ে নতুন করে বাঁচার আশ্বাস দেয়। এই আম্ফান ঘূর্ণিঝড় প্রতিটি মানুষ এর মধ্যে একটি দুঃস্বপ্নের মত হয় থাকবে সারাজীবন। এই ঘূর্ণিঝড়ের কবলে আমারও অভিজ্ঞতা খুব একটা ভালো ছিল না, এই ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বহু গাছ ভেঙে পড়েছে, বৈদ্যুতিক খুঁটি ও তার সমস্ত ঝড়ের তীব্র গতির কাছে পরাস্ত হয়, এবং বিভিন্ন বড়ো বড়ো ফ্ল্যাট ও বিল্ডিং এর কাঁচের জানলা সমস্ত ভেঙে পড়ছিল রাস্তার উপর, আর আসে পাশের বাড়ির টিনের ছাউনি উড়ে এসে পড়ছিল। এই রকমই একটা টিনের ছাউনি আমাদের বিদ্যুতের তারে এসে পড়ে এবং আমাদের বাড়ির ও আমাদের পাশের বাড়ির বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সেই দুর্ঘটনার কথা তখনই আমাদের তরফ থেকে বিদ্যুত পরিষেবা কেন্দ্রে জানানো হয়। আমাদের বাড়ির বিদ্যুৎ পরিষেবা টানা ১ সপ্তাহ বন্ধ থাকে। এই সময় আমাদের অনুরোধে আমাদের

প্রতিবেশী সাহায্যের হাত বাড়ায় ও তাদের থেকে আমরা বিদ্যুত পরিষেবা নিয়ে থাকি, এবং তার জন্য আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। বিভিন্ন সিম কার্ড এর নেটওয়ার্ক পরিষেবা ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতেও বিঘ্ন ঘটে। ইন্টারনেটের অভাবে অফিসিয়াল কাজ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যাগুলি আরও বেড়ে যায়। এমন এক সময়ে আমাদের কাছে ছিল একমাত্র রেডিও পরিষেবা, যা সত্যিই

একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় সেই সময়। পশ্চিমবঙ্গ রেডিও ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস বলেছিলেন “আমরা রেডিওতে বার্তা পাওয়ার পরেও মানুষের জন্য অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করেছিলাম। আমরা রেডিওর কারণে বেশ কয়েকটি মানুষের জীবন বাঁচিয়েছি”। এটা সত্যিই একটি গর্বের বিষয়। এই আম্ফান ঘূর্ণিঝড়ে শুধু এইটুকুই নয়, প্রবল বৃষ্টিপাতেরও সাক্ষী হয়ে আছি আমরা। এই ঝড় চলাকালীন প্রবল নিম্নচাপ এক ভয়ানক রূপ নেয় এবং চারিদিকে রাস্তাঘাট ও পুকুর খাল নদী নালা সমস্ত জলে ভেসে যায়। প্রবল বৃষ্টি ও তার উপর বিদ্যুতের তার কেটে সেই জলে পড়ে থাকায় বহু মানুষ অজান্তেই প্রাণ হারিয়ে বসে। চারিদিকের ভয়ানক পরিস্থিতি তে মানুষের মৃত্যু অনিবার্য হয় উঠেছিল যেন। আমরা যখনই টিভি চ্যানেলে খবর দেখছি তখন দেখেছি শুধুই দুর্ঘটনার কবলে প্রাণ হারানোর বিভিন্ন পরিসংখ্যান ও মানুষের বাসস্থান ঝড়ের তান্ডবে গুঁড়িয়ে পড়ার বিভিন্ন তথ্য।

আমাদের পাড়ার একটি বিশাল এবং অনেক দিনের কদমগাছ ভেঙে পড়ে ও তাতে অনেক ক্ষতি হয় তার চারপাশের। এর সাথেই আমাদের আসে পাশে থাকা সুন্দর গাছপালা দিয়ে সাজানো উদ্যান নষ্ট হয় এই আম্ফানের তাণ্ডবে।

পূজা হলদার

এই ঝড়ের গতিবেগ অত্যন্ত তীব্র ছিল, একেই এই করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্ক, সমস্ত মানুষের জীবিকা তে বাধা পড়ে যাচ্ছে এবং গরিব মধ্যবিত্ত দের প্রতি টা দিন একটা চ্যালেঞ্জ এর মতো হয় উঠছে, আর তার উপর আম্ফানের অভিজ্ঞতা সত্যি একটি দুঃস্বপ্নের মতো। এই সময়ে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অবদান সত্যিই সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে সাহায্য করেছিল।

২০২০ সালের ১৭ ই মে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় আম্ফান ঘূর্ণিঝড় তীব্র আকার ধারণ করে এবং ২০শে মে এই ঘূর্ণিঝড় পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ উপকূল অতিক্রম করে। ঘূর্ণিঝড় ক্ষতিগ্রস্থ জেলা হাওড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং সুন্দরবনের কয়েকটি গ্রাম। শোনা গেলো একটি বড়ো অংশের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল (৪২৬৩ বর্গ কিমি বন ১২০০ বর্গ কিমি) ধ্বংস হয়ে গেছে সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় দ্বারা। ক্ষতি বেশিরভাগই ছিল পাথরপ্রতিমা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতালি এলাকায়। ক্ষতি বৃহৎ ভাবে হয়েছে ভারতের অন্যতম অরণ্য সুন্দরবন অঞ্চলে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের থেকে জানা গেছে যে সুন্দরবন এলাকার মোট ২৮% ম্যানগ্রোভ অরণ্য এই ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত। বিভিন্ন জায়গায় ধ্বস নেমেছে, বহু পশুপাখি তাদের বাসস্থান হারিয়েছে ও অনেকের প্রাণ ও সংকটে পড়েছে। আমাদের সাজানো গোছানো সবুজে ভরা ম্যানগ্রোভ অরণ্যের রূপ বদলে দিয়েছিল এই আম্ফান ঘূর্ণিঝড়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কাকদ্বীপ এবং নামখানা এবং উত্তর চব্বিশ পরগনার মিনাখা ও হিংগলগঞ্জ ঘূর্ণিঝড়ের দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, যা হল সাগর দ্বীপের

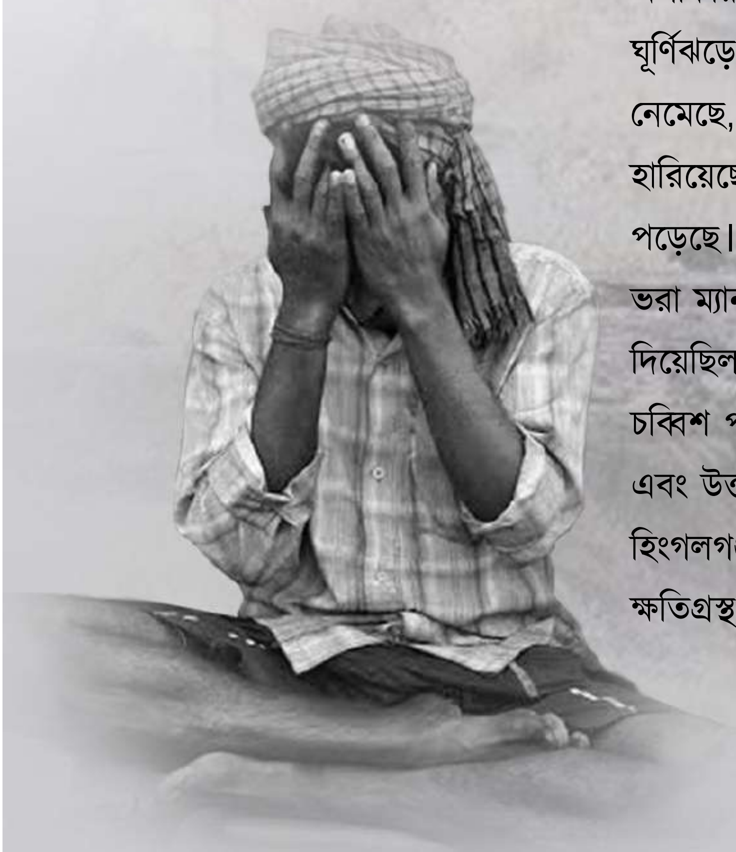

নিকটবর্তী স্থলভূমি। আটটি জেলা থেকে ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে, তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে দক্ষিণ ও উত্তর চব্বিশ পরগনা সহ উপকূলীয় জেলাগুলিতে, যা সত্যিই খুব দুঃখজনক। বাংলার মানুষের এই বেঁচে থাকার লড়াই কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছিল।

এছাড়াও খবরে দেখা গেল রাজ্য সরকার নিশ্চিত করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে ৯৮জন প্রাণ হারিয়েছে এবং রাজ্যের আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি প্রায় ১ লক্ষ কোটি হয়েছে। বেশিরভাগ হতাহতের ঘটনা ঘটে বিদ্যুৎপাত, পতিত গাছ এবং ভেঙে পড়া কাঠামোর কারণে। মানব ও প্রাণিসম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বিশাল পরিমাণে। এছাড়াও ঘূর্ণিঝড়টি কৃষকদের ধান, আম, লিচুর মতো শস্য ও ফসলের মারাত্মক ক্ষতি করেছে। হাজার হাজার গাছ উপড়ে পড়েছে। রাজ্য রাজধানী কলকাতায় বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ ব্যাহত হয়। রাজ্যের অনেকে তাদের পুরো বাড়িও হারিয়েছে। খবরে দেখতে পেলাম দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে সর্বাধিক ১৮ জন মৃত্যুর রেকর্ড হয়েছে, এবং তারপরে উত্তর ২৪ পরগনাতে ১৭ জন মারা গেছেন। এই পরিস্থিতি তে রাজ্য সরকার জাতীয় দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া বাহিনীর সহায়তায় বহু ত্রাণের ব্যবস্থা করেছেন। এরকম বহু ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমাদের এই আম্ফান ঘূর্ণিঝড়ের অভিজ্ঞতা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ঘটে যাওয়া ভয়ানক প্রতি টা মুহূর্ত যা চোখের সামনে দেখা এবং টেলিভিশন এর পর্দায় দেখা, তার সমস্ত টাই আমার জীবনে একটা ভয়ংকর স্মৃতি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

সাথী আদিত্য ও পায়েল দাস গুপ্ত
দর্শন বিভাগ
দ্বিতীয় সেমেস্টার

করোনার ভয়াবহ সংকটের মধ্যে অনলাইন ক্লাস এর সুবিধা ও অসুবিধা

আজ সমগ্র বিশ্ব করোনা নামক মহামারীর আক্রমণে বিপন্ন ও বিধ্বস্ত। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের জীবন যাপনের ওপর আজ করোনা নামক সংক্রমণের করাল থাবা এসে পড়েছে। এই সংক্রমণের হাত থেকে বিশ্বের অন্তর্গত কোন দেশি-ই ছাড় পায়নি। চীন, আমেরিকা, ব্রাজিল, ফ্রান্স, রাশিয়া, প্রভৃতি দেশ সহ আমাদের ভারতবর্ষের বহু মানুষ আজ করোনা নামক সংক্রমণে সংক্রমিত। এই সংক্রমণের ভয়াবহ প্রভাব শুধু মানুষের স্বাস্থ্যের ওপরে পড়েনি, একসঙ্গে মানুষের জীবনযাপন,চাকরি, ব্যবসাবাণিজ্য, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমনকি শিক্ষাব্যবস্থাতেও পড়েছে। যখন কোন মহামারী আসে তখন তা ক্ষতি করার পাশাপাশি অনেক শিক্ষাও দিয়ে যায়। শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর করোনার ভয়াবহতা গভীর প্রভাব ফেলায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সহ ভারতবর্ষের বহু ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এমন অবস্থায় প্রতিটি শিক্ষার্থী যাতে বাড়িতে বসে কোনরকম সময় নষ্ট না করে শিক্ষা অর্জন করতে পারে তার জন্য ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার অনলাইন ক্লাস করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। যার ফলে বহু শিক্ষার্থী ঘরে বসে নিরাপদে স্মার্ট ফোন, কম্পিউটার, বা ল্যাপটপের মাধ্যমে স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা অধ্যআপক-অধ্যাপিকাবৃন্দের কাছ থেকে নিজেদের পঠনপাঠন এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছে। আমি নিজেও এই অনলাইন ক্লাস করার দরুণ বেশ কিছুটা উপকৃত হয়েছি। এই অনলাইন ক্লাস এর ফলে দিনের অর্ধেকটা সময় শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার মধ্যে থাকতে পারছে, যার ফলে তারা তাদের মানসিক প্রতিকূলতা ও দৈনন্দিন একঘেয়েমিকে অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে পারছে বা পারবে। প্রত্যেকটা দিন কিছুটা সময় অনলাইন ক্লাস হওয়ার ফলে পড়াশোনার ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখা শিক্ষার্থীদের পক্ষে অনেকটাই সহজ হয়, এবং মাঝে মাঝে দু'একটা করে ক্লাস টেস্ট নেওয়ার ফলেও শিক্ষার্থীরা অনেকটাই উপকৃত হচ্ছে। এছাড়াও অনলাইন ক্লাস হওয়ার দরুণ শিক্ষার্থীরা অনেক অনেক নতুন জিনিস শিখতে পারছে নিরাপদে বাড়িতে বসে। অনেক নতুন নতুন অ্যাপ এর বিষয়েও তারা অনেক কিছু জানতে পারছে।

কিন্তু যে কোন জিনিসেরই যেমন একটা ভালো দিক থাকে তেমনিই কিছু খারাপ দিকও থাকে। ঠিক সেইভাবেই আমাদের ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের নেওয়া এই অনলাইন ক্লাস

এর মাধ্যমে পড়াশোনারও যেমন কিছু সুবিধা অর্থাৎ ভালো দিক আছে তেমনি তার পাশাপাশি কিছু অসুবিধা অর্থাৎ খারাপ দিকও আছে। সেই কারণে আমি ব্যক্তিগতভাবে কখনোই সম্পূর্ণভাবে অনলাইন ক্লাস এর মাধ্যমে লেখাপড়া করাকে অনক্যাম্পাস পড়াশোনার বিকল্প হিসাবে মনে করি না।

আজকের এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যা যে অনেকটাই অগ্রসর হয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের দেশের মধ্যে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে আজও এই প্রযুক্তি বিদ্যার আলো পুরোপুরিভাবে প্রবেশ করতে পারেনি। অনেক শিক্ষার্থী আছে যাদের দুবেলা খাওয়ার মত কোন সংস্থান নেই। এই রকম পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে তাদের পক্ষে ল্যাপটপ বা ফোন কেনা বা তার খরচ চালানো কোনোও মতেই সম্ভব হয়ে ওঠেনা।

এছাড়াও অনলাইন ক্লাস এর ক্ষেত্রে আরও বেশ কিছু সমস্যা দেখা দেয়। যেমন – অনলাইন ক্লাস চলাকালীন পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে অনেক ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে, আর সেটাই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা ও অধ্যাপক অধ্যাপিকা লাইভ থাকা

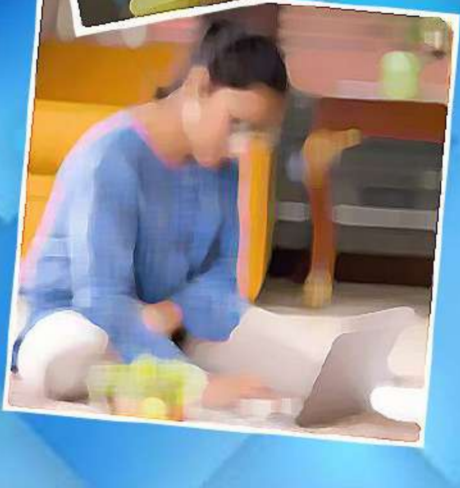

অবস্থায় কিভাবে সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবেন ? – এটিও একটি বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া ইন্টারনেট কানেকশনও অনলাইন ক্লাস করার ক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। বড় বড় শহরগুলিতে তাও তো শিক্ষক আর ট্র্যাডিশনাল শিক্ষা প্রদানের মান মোটামুটি ভাবে পর্যায়ের মধ্যে আছে। সেখানকার কানেক্টিভিটি ও কনটেন্ট ব্যবস্থাও বেশ উন্নত মানের হয়।

এইসব উন্নত মানের প্রযুক্তির আবরণে মোড়া শহরগুলির বাইরে বেরোলে আমাদের দেশের বাস্তব চিত্রটিকে অনুধাবন করতে পারা যায়। এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে শিক্ষার্থীদের যথাযথ শিক্ষা প্রদানের মতো উপযুক্ত একজন শিক্ষকও নেই। এছাড়া অনলাইন ক্লাস এর ক্ষেত্রে নেটের খরচ চালানোটাও একটা বড় ধরনের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় অনেক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে, এই কারণে আমার ব্যক্তিগত ভাবে মনে হয়েছে যে, আন্ডারগ্রাজুয়েট লেভেলের যে পড়াশোনা বা ল্যাবরেটরী ওয়ার্ক – এই সমস্ত কাজ অনলাইন ক্লাস এর মাধ্যমে করা একেবারেই সম্ভব নয়।

উপরিউক্ত আলোচনার ওপর ভিত্তি করে দেখা যাচ্ছে যে, এই অনলাইন ক্লাস এর মাধ্যমে পড়াশোনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সুবিধার পাশাপাশি অনেক অসুবিধার সম্মুখীনও হতে হয়। কিন্তু তা সত্বেও বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আমাদের এই অনলাইন ক্লাস এর মাধ্যমে পড়াশোনা করার পদ্ধতিকে মান্যতা দিতে হবে।

সুস্মিতা কর্মকার
দর্শন বিভাগ
দ্বিতীয় সেমেস্টার

গৃহবন্দী

বিশ্বের প্রতিটি মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যস্ত ছিল। রাস্তা-ঘাট, মন্দির-মসজিদ, অফিসআদালত-, স্কুল-কলেজের সেই ভিড়, হাজার হাজার মানুষের আনাগোনা, তাদের চিৎকার সব যেন একমুহূর্ত হারিয়ে গেল। সব আনন্দ, উল্লাস, শোরগোল, মানুষের ভিড় এসব যেন রাহুর মতো গ্রাস করে নিল এক মারণ ভাইরাস যার নাম করোনা (COVID-19)। এই মহামারি যত দিন বাড়ছে তত আরও ভয়ানক আকার ধারণ করছে, রোজ হাজার হাজার মানুষ এই ভাইরাসের দ্বারা সংক্রামিত হচ্ছে, কিছু মানুষ সুস্থ হচ্ছে আবার তেমন অনেক মানুষ মারাও যাচ্ছে কারণ এই মারণ ভাইরাস দমন করার মতো কোনো ড্রাগ বা ভ্যাকসিন চিকিৎসকদের কাছে নেই। তাই সংক্রমণ কমাতে একমাএ উপায় লকডাউন। শুধু ভারতবর্ষেই নয় বিশ্বের নানান দেশে সরকারের নির্দেশ মতো এই লকডাউন ব্যবস্থা কঠোরভাবে মানা হচ্ছে যাতে ভ্যাকসিন

আবিস্কার না হওয়া পর্যন্ত মানুষজন কিছুটা হলেও এই মারণরোগে সংক্রমিত হওয়া থেকে মুক্তি পায়।

আজ প্রায় চার মাস হল আমরা এই লকডাউন, করোনা ভাইরাসের মতো ভয়াবহ মহামারির মধ্যে আছি। আর আশায় আছি যে খুব তাড়াতাড়ি বৈজ্ঞানিকরা এই মহামারি রোধের ওষুধ আবিষ্কার করবেন। এই লকডাউন শুধু আমার জীবনের নয় আমার মতো আরও অসংখ্য মানুষের জীবনের অদ্ভুত ও অকল্পনীয় অভিজ্ঞতা। একদিকে যেমন আমরা অফিস-কাছারি, স্কুল-কলেজ থেকে বহুদূরে বাড়িতে আছি, তেমনি আবার পরিবারের সাথে হাসিঠাট্টা-, খেলা-আড্ডা এসবের মধ্যে সময় কাটাতে পারছি। আমাদের অনেক নতুন নতুন বিষয়ে অভিজ্ঞতা হচ্ছে, অনেক সুন্দর স্মৃতি যেমন সংগ্রহ করছি, তেমনই অনেক ভয়াবহতা, অনেক ক্ষয়িষ্ণুতারও সাক্ষী হচ্ছি। গোটা বিশ্বের সব স্থানেই কোথাও না কোথাও দীনদুঃখী, গরীব, অসহায় মানুষ থাকেন যাদের দুবেলা দুমুঠো ভালো-মন্দ খাবার জোটে না। এমতাবস্থায় সারা বিশ্বে এই মারণ মহামারি ছড়িয়ে পড়ায় উচ্চ ও মধ্যবিত্ত দের চেয়েও বেশি দুর্ভোগ এই অসহায় নিম্নবিত্তদের। লকডাউনের মধ্যে তারা কোথাও কাজও পাচ্ছে না যার ফলে ঠিকমতো খেতেও পাচ্ছে না এই গরীব মানুষগুলো। এই পরিস্থিতির সঙ্গে যদিও বা তারা কোনোমতে লড়ার সাহস পাচ্ছিল কিন্তু সেই সাহসও ভেঙ্গে দিল ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আম্ফান। এ এমন এক ঘূর্ণিঝড় যা ভারতবাসী এর আগে কখনও দেখেনি। হাজার হাজার বাড়িঘর, গাছপালা ভেঙ্গে পড়ল, কত মানুষের মাথার ছাদটুকু কেড়ে নিল। প্রত্যেকটি মানুষের মনে দাগ কেটে গেল এই আম্ফান। তাও এই মানুষগুলো একেবারে ভেঙে পড়েনি। তারা প্রাণপণে লড়েছে। তাই যাদের পরিস্থিতি একটু হলেও ভালো তাদের উচিৎ নিজেদের সাধ্য মতো ওই গরীব মানুষগুলোকে সাহায্য করা।

এই লকডাউনে থাকতে থাকতে যেমন আমাদের নানারকম সুপ্ত দক্ষতার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে তেমনই আরও একটা বিষয় উপলব্ধি করছি যে, আমরা মনুষ্যজাতি, যারা ঘর থেকে না বেরিয়ে থাকতে পারি না, যাদের কারণে-অকারণে প্রতিনিয়ত বাইরে বেরোতে হয়, সেই আমরা এতদিন ধরে ঘরে বন্দি হয়ে আছি। বাইরে বেরোনোর জন্য খোলা আকাশের নীচে স্বস্তির নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য ছটফট করছি, ঠিক সেখানেই উপলব্ধি করছি যে, ওই চিড়িয়াখানার খাঁচায় বন্দি পশুপাখি গুলির অনুভূতি। তারা সবসময়ই ওই লোহার খাঁচায় বন্দি হয়ে থাকে। বাইরে বেরোনোর কোনো পথ বা রাস্তা নেই তাদের। আজ আমাদের এই বন্দিদশা ঠিক তাদেরই মতো। তবে এতো কষ্ট, চারিদিকে এতো হাহাকার-এর মাঝেও আমি প্রতিদিন এই আশায় আছি যে, বৈজ্ঞানিকরা খুব তাড়াতাড়ি এই করোনার প্রতিষেধক আবিস্কার করে গোটা বিশ্বকে করোনা মুক্ত করবেন। আবার বাচ্চারা স্কুলে যাবে, সিনেমাহলগুলো আবার দর্শকের ভিড়ে গমগম করবে। আবার সেই ট্রামের আওয়াজ, ধর্মতলার ফুটপাত গমগম করবে, আবার কবে দুনিয়া নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখবে, আবার কবে সকলের মুখে হাসি ফুটবে __ সেই "আবার"–এর প্রতীক্ষা __ তবে যেন সেই "আবার" খুব তাড়াতাড়ি আসে।

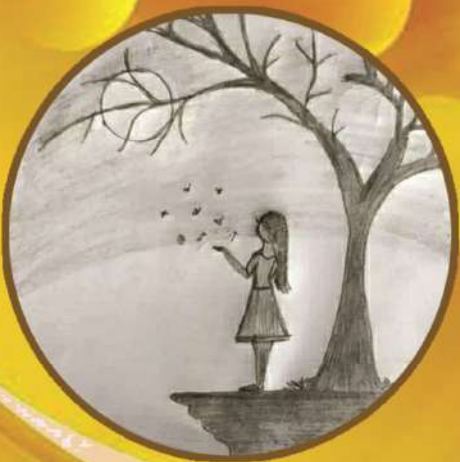

আত্রেয়ী কর্মকার

মৌমিতা দেবনাথ
দর্শন বিভাগ
দ্বিতীয় সেমেস্টার

জীবনের ছন্দপতন

সেদিন ছিল ২২ শে মার্চ, ২০২০। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন জনতা কার্ফু। আমরা স্ব-গৃহে দেশের সকল স্বাস্থ্য কর্মী, পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য বিকাল ৫ টায় শঙ্খ-ঘন্টা ধ্বনি করে তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালাম।এর পরেই লকডাউনকে সমর্থন করে নির্দেশ এল ৫ই এপ্রিল রাত ৯ টায় প্রদীপের আলোয় প্রকৃতিকে বরণ করার। চারিদিক মোমবাতির আলোয় ভরে গেল। মনে হল যেন আকাশের নক্ষত্ররাজি নেমে এসেছে ধরিত্রীর বুকে। আকাশে উড়ল ফানুস, সেই সঙ্গে পটকার আওয়াজ। মনে হল যেন অকাল দেওয়ালীর শুভ উদ্বোধন। এই সময় দিনের বেলায় প্রখর সূর্যের তাপ। গাছপালা গুলো দাঁড়িয়ে আছে জলের আশায় দেহকে একটু শীতল ও সিক্ত করার জন্য। আকাশে নেই পেঁজা তুলোর মত মেঘেদের আনাগোনা। রাতের আকাশ ও থাকে থমথমে। ভ্যাপসা গরমে জীবকূল হয়ে উঠেছে অতিষ্ঠ। গ্রীষ্মের তাপদাহে ভুলতে চলেছি আহার – নিদ্রা ।যাক্ আমরা তো বাঙালি। বারো মাসে তেরো পার্বণ আমাদের নিত্য সঙ্গী। সেই সঙ্গে শুরু হল নতুন একটি পার্বণ যার নাম লকডাউন। এখন কি করব ভেবে পাচ্ছি না। পরিবেশটা আদৌ মানানসই

হচ্ছে না। কোথা থেকে শুরু করব সেটাই তো বুঝতে পারছি না। এই রকম প্রতিকূল পরিবেশের সাথে মানিয়ে চলার উপকরণ গুলো যেন নাগালের বাইরে। প্রাত্যহিক জীবনের চলার পথের ছন্দ গেছে ভেঙ্গে। কোন পথে যে চলি, আমারা দিশাহারা পথিক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখন আর যেতে হবে না। মা-বাবার কাছে পড়ার জন্য বকুনি খেতে হবে না। মনে হচ্ছে আমরা যেন রবি ঠাকুরের শৈশব ফিরে পেয়েছি। এই ভাবনা টা খুবই ভালো। নিজেকে নিজেই আবিষ্কার করতে পারবো। আমি প্রকৃতির ছন্দের সাথে নিজেই সুর মেলাবো। রবি ঠাকুর তো প্রকৃতিকে আপন করে পেয়েছিলেন। তাহলে আমাদের প্রকৃতির সাথে মিশে যেতে আর নিষেধ রইল না। আমাদের মধ্যে ভাবনা আছে প্রচুর। এইভাবে কয়েক দিন যেতে না যেতেই ভাবনা গুলো হারিয়ে যেতে লাগল। যেদিকে তাকাই মনে হয় সব কিছুই যেন নীরস। আর আমি ঘরের মধ্যে আবদ্ধ একটা জীব মাত্র। এইভাবে দীর্ঘদিন ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতে থাকতে আমাদের মনের সুর,তাল ও ভাবনায় ছেদ পড়তে লাগলো। আমরা কি তাহলে কারাগারে বন্দি হলাম ? সকলের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। মানুষের রুটি-রুজি প্রায় বন্ধ হতে চলেছে। প্রত্যেকের মধ্যে একটা চাপা আর্তনাদ ---- কবে আমরা ফিরতে পারব স্বাভাবিক জীবনের চলার পথে।

প্রচার মাধ্যমে জানতে পেরেছিলাম যে ---- চিন দেশের উহান শহর থেকে করোনা নামের এক অদৃশ্য ডাইনি তার নিজস্ব যানে পাড়ি দিয়েছে দেশ-দেশান্তরে। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল আরও বহু দেশ ভ্রমণ করে

সেখানকার অধিকাংশ মানুষের সাথে পরিচিত হয়ে এখন তার লক্ষ্য জনবহুল রাষ্ট্র ভারতের মানুষের কাছ থেকে তার ন্যায্য অধিকার অর্জন করা। তাহলে উনি কি দেবী মনসা ? ভারতে এসে প্রতি ঘরে-ঘরে গিয়ে চাঁদ সওদাগর কে খুঁজে চলেছেন। পৌরাণিক কাহিনীতে আমাদের দেশে দেব-দেবীর সংখ্যা

গুনে শেষ করা যায় না। আমারা ভয়ে ও ভক্তিতে দেব-দেবীদের স্মরণ করে থাকি সকল প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য। করোনাকে নিরস্ত করার জন্য আমাদের দেশের মানুষ স্ব-গৃহে পূজো দেওয়া থেকে শুরু করে গোমুত্র পর্যন্ত সেবন করেছে। জানিনা এগুলো মানুষের অন্ধ বিশ্বাস কিনা। বর্তমানে আমরা সকলে করোনা নামে এই অশুভ শক্তির কাছে ধরাশায়ী। কর্মই আমাদের জীবন। সেই চলার পথে আমরা থমকে গেছি। এইভাবে দিনের পর দিন যেন আমরা অকাল বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে চলেছি। কবে যে এর থেকে পরিত্রাণ পাব জানিনা।

এর মধ্যেই আগমন হল 'আমফান' নামে এক সুপার সাইক্লোনের। যদিও প্রচার মাধ্যমে কথাটা আমারা আগেই জেনেছিলাম। ঝড়, তুফান, অতিবৃষ্টি আমাদের নিত্য সঙ্গী, যা আমরা ছোট বেলা থেকেই দেখে আসছি। সেই জন্য প্রথমে মনের মধ্যে বিশেষ কোনো আশঙ্কা তৈরী হয়নি। ঐ দিন মধ্যাহ্ন ভোজটা ভালো ভাবেই সেরে নিলাম। অপরাহ্নেই আমাদের এখানে শুরু হল প্রকৃতির খামখেয়ালীপনা। চারিদিকে বেজে উঠলো অশনি সংকেত। অসুর রূপী

‘আমফান’ আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে প্রচন্ড গতিতে। ঘরের মধ্যে থেকে কাঁচের জানালা দিয়ে প্রকৃতির এই তান্ডব নৃত্য দেখেই চললাম। সতীর দেহ ত্যাগে শিব ক্রুদ্ধ হয়ে সতীর দেহ নিজ কাঁধে নিয়ে নৃত্য করেছিলেন, আর সেই খন্ডিত দেহ মর্তের যে সকল স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই সকল স্থান হয়ে ওঠে তীর্থপিঠ। আর অসুর রূপী আমফানের তান্ডব নৃত্যে অনেক মানুষ বলি হল,আবার অনেকে হল গৃহহারা।

এইভাবে দীর্ঘ প্রায় পাঁচ মাস ঘরের মধ্যে আবদ্ধ আছি। আমাদের এখন বিশেষ কোনো কাজ নেই। কাজের মধ্যে দুই – খাই আর শুই। এখন একটা ধারণা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। আমাদের কি তাহলে খাওয়ার জন্য বাঁচা , না বাঁচার জন্য খাওয়া। আমারা হলাম শিক্ষার্থী। আমাদের শিক্ষার শান দেওয়ার যন্ত্রপাতি গুলি এই ভাবে আমাদের অলস অধ্যয়নের ফলে মরচে ধরতে চলেছে। গুরু-শিষ্যের সাক্ষাত নেই। যদিও অন-লাইন শিক্ষা দান চালু হয়েছে তবুও শিক্ষার ক্ষেত্রে কোথাও যেন একটা অপূর্ণতা থেকেই যাচ্ছে। প্রত্যক্ষ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমরা যে দক্ষতা অর্জন করতে পারি, সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে শিক্ষার পরিপূর্ণতা লাভ করা যায়। আমাদের জ্ঞানের পরিসীমা একটা সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ হতে চলেছে। আমারা অনেকেই আবার মোবাইল নামক যন্ত্র মাধ্যমটির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। যেহেতু অনেকের এই যন্ত্রটির ক্রয় ক্ষমতা এই পরিস্থিতিতে সাধ্যের বাইরে। এখন বই গুলো মনে হয় যেন বিশাল একটা বোঝা। 'We are like as peeping birds' --- তাহলে আমরা কি অকালেই ঝরে যাবো ? জানিনা আমরা আমাদের ভাবনা-চিন্তা বাস্তবের সামনে তুলে ধরতে পারব কি-না। আমরা সকলে প্রকৃতির জীব। প্রকৃতিই আমাদের একমাত্র ভরসা। ‘প্রকৃতি’ তুমিই জাগো --- রক্ষা করো আমাদের-এই প্রার্থনা।

মেঘা ক্ষত্রী
দর্শন বিভাগ
দ্বিতীয় সেমেস্টার

আমার মা

একটা একটা করে ঢেউ সমুদ্রতটে আছড়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে এই ঢেউ-এর মত এক একটা সময় এইভাবেই আছড়ে পড়েছে আমার জীবনে। জীবনের সময়গুলো কিভাবে যে পার করে আসলাম জানিনা। আমি এখন ত্রিশের ঘরে পা দিয়েছি। একটা চাকরি করি। রোজকার একঘেয়েমি, অক্লান্ত পরিশ্রম করতে করতে যখন হাঁপিয়ে উঠি, তখন অবসর আর একঘেয়েমিটা কাটানোর জন্য মাঝেমাঝে পুরীর সমুদ্রের তীরে ছুটে আসি। পুরীর ঢেউগুলো যেনো আমার জীবনে কাটানো সেই দিনগুলোকে মনে করিয়ে দেয়।

ছোটবেলা আমার কলকাতা শহরেই কেটেছে। আমি, মা, বাবা, ভাই মিলে চারজনের একটি সুখী পরিবার। আমাদের চারজনের এই পরিবারে ছোটবেলা অনেক হাসি মজা করে কেটেছে। তখন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম মাকে। মায়ের ভূমিকা আমাদের পরিবারে আমাদের জীবনে অনবদ্য। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন আমাদের জন্য মা। 'মা' শব্দটা ছোট্ট হলেও তার গুরুত্ব যে কতখানি

সে কথাই আমি লিখতে চলেছি। আমার মা ছোট্ট একটা কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার জন্য ভোরবেলা উঠে আমাদের জন্য সবকিছু প্রস্তুত করে দিতেন, যাতে সারাদিন আমাদের কোন অসুবিধা না হয়। তখনো বুঝিনি মা হওয়া কত কঠিন। শুধু দেখতাম মা রান্না করছেন, আমি আর ভাই মায়ের সাথে মজা করছি, খুনসুটি করছি মায়ের কাজে বাধা দিচ্ছি। মা রেগে গিয়ে খুব বকাবকি করছেন, আবার কোলে তুলে আদর করছেন। আমি আর ভাই যখন ঝগড়া করতাম, মারপিট করতাম, বাবা রেগে গিয়ে বকাবকি করতেন। কিন্তু মা আমাদের আদর করে দিতেন। আবার কখনো বাবার সঙ্গে একমত হয়ে আমাদের বকাবকিও করতেন। মা কি সুন্দর ভাবে আমাদের সকলকে আগলে রাখতেন। মায়ের ভূমিকা সত্যিই অনবদ্য ছিল আমাদের পরিবারে।

একদিন হঠাৎ করে আমাদের সুখের পরিবারে প্লাবন আসলো, ঠিক যেমন সমুদ্রে যখন জোয়ার আসে বড় বড় ঢেউ গুলো সমুদ্রের পাড়ে আছড়ে পড়ে, ঠিক তেমনি যেন একটা বড় ঢেউ আমাদের সংসারে আছড়ে পড়ল। হঠাৎ করে বাবার কেমন যেন পরিবর্তন হয়ে গেল। যে বাবাকে চিনতাম সেই বাবাকে যেন আর চিনতে পারছিনা। প্রতিনিয়ত মা এবং বাবার মধ্যে অশান্তি হচ্ছে। মাকে দেখেছি কি অসীম ধৈর্য শক্তির অধিকারী। বাবার অত্যাচার যেন দিন দিন আরও বাড়তে থাকলো। আমাদের সাথে বাবার দূরত্ব যেন বাড়তে শুরু করল আর আমরা যেন কেমন অজান্তেই মা কেন্দ্রিক হয়ে পড়লাম। মায়ের অসীম ধৈর্য শক্তি দেখে কখনো মনে হতো মা যেন দুর্গা রূপী, কখনো কালী-রূপী, আবার কখনো অন্নপূর্ণা। মা তার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমাদের আগলে রাখতে শুরু করলেন, ঠিক যেমন সদ্যোজাত শিশুকে মা তার বুকে আগলে রাখেন। একটা ছোট্ট চারাগাছকে জল সার, যত্ন দিয়ে একটু একটু করে বড় করার পর সে বড় হয়ে ওঠে, যেমন আমাদের ফল দেয়, আমাদের ফুল দেয়, ঠাণ্ডা ছায়া দেয়, তেমনি যেন মায়ের ছায়া আমাদের চারপাশে থেকে আমাদের আগলে রাখত। একদিন বাবা হঠাৎ হারিয়ে গেলন। বাবার অনুপস্থিতিটা মা যেন কিছুতেই বুঝতে দিলন না। মা-ই ধীরে ধীরে বাবা হয়ে উঠলেন। মা শব্দটা

ভীষণ ছোট। বাংলা অভিধানের মায়ের থেকে ছোট শব্দ খুঁজলে আর পাওয়া যাবে না। তখন বুঝতাম না, শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম মা-কে। মায়ের সেই ছোট্ট ছোট্ট অনুভূতিগুলো যেন ধীরে ধীরে আমাদের পালটে দিতে শুরু করল। মাকে দেখে কখন যেন জীবন যুদ্ধকে জয় করার কৌশল শিখে গেলাম। কিন্তু একটু একটু করে বুঝতে পারছিলাম মা-এর সেই শক্তি যেন কোথাও ক্ষয় হচ্ছে ধীরে ধীরে। ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করলেও যেন পুরোটা বুঝতে পারতাম না, বা বুঝতে দিতেন না মা। সব সময় হাসিমুখে আমাদের সামনে থাকতেন, হাসিমুখে সব কাজকর্ম করতেন। মানুষটার ভেতরে যে কতবড় ক্ষত হয়েছে সেটা তিনি বুঝতে দিতেন না। আর যেদিন পুরোটা বুঝলাম সেদিন সবকিছু ধরাছোঁয়ার বাইরে।

ভাই একটু একটু করে নিজের পায়ে প্রতিষ্ঠিত হলো। আর আমি তো আগেই বলেছি আমি একটা কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত। আমরা যখন বাড়ি ফিরতাম, দেখতাম মা আমাদের জন্য সবকিছু তৈরি করে রেখেছেন। যখনই বলতাম, "মা তোমার কি কষ্ট হচ্ছে?" মা অমলিন হেসে উত্তর দিতেন, 'তোদের হাসিতে আমার সুখ। আমার আবার কিসের কষ্ট?' এইভাবে একটু একটু করে দিন চলতে থাকলো।

আমার সামনে এখন জল আর জল। ঢেউ আর ঢেউ। রাতের অন্ধকারেও আমি পরিষ্কার দেখতে পারছি। এক একটা ঢেউ সমুদ্রতটে আছড়ে পড়ছে। আমার যেন এক একটা দিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সেদিন আমার জন্মদিন ছিল আর আমার কাজও ছিল ভীষণ। তাই আমি ঘুম থেকে উঠে মাকে প্রণাম করে তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেলাম। সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে দেখি মা আমার দু-তিনজন প্রিয়-বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছেন এবং ছোট করে, খুব সুন্দর ভাবে আমার জন্মদিনের আয়োজন করেছেন। আমি অবাক হয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ঝড়ঝাপটা কষ্ট গুলো নিজের বুকের ভেতর চেপে রেখে আমার মুখে কিভাবে হাসি ফুটবে তাই চেষ্টা করলেন তিনি। মা বলেই হয়তো এমন টা সম্ভব হয়েছিল।

আবার আর এক দিনের কথা মনে পড়ে গেল। হঠাৎ করে সেদিন ভাইয়ের জন্মদিনে ভাই তার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে বাড়িতে হাজির হয়েছে আমাদের কিছু না জানিয়ে। আমি তো ভাবছি মা সামলাবেন কি করে? কিন্তু মা সুন্দরভাবে মুহূর্তের মধ্যে এমন কিছু রান্না করলেন যেটা আমরা সবাই খুব তৃপ্তি করে, আনন্দ করে, মজা করে খেলাম। ভাইয়ের বন্ধুরা খুব আনন্দ করলো, মজা করল। সেদিন কিন্তু দেখলাম কোথাও যেন মায়ের একটা বড় কষ্ট। একটু একটু করে উপলব্ধি করতে পারলেও পুরোটা আমি বুঝতে পারছিলাম না।

একদিন আমিও নিজের বাড়ি ছেড়ে, সেই পরিবেশ ছেড়ে অন্য একটা বাড়িতে আসলাম। আমার বিয়ে হল। অন্য একটা পরিবেশে আসলাম। যখন এলাম তখন বুঝলাম না নিজের বাড়ী ছেড়ে আসার কষ্টটা। অন্য বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে বুঝলাম মায়ের সম্পর্কের সঙ্গে এই বাড়ির কতটা তফাৎ। মায়ের সেই অনুভূতির খুব অভাব এখানে। ধীরে ধীরে নিজেকে মায়ের মত তৈরি করতে শুরু করলাম। যেসব শিক্ষা আমি আমার মায়ের কাছ থেকে পেয়েছি সেইভাবে সহানুভূতিশীল, অসীম ধৈর্য্য, সহকারে সবার সাথে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলাম। এইভাবে বেশ দিনগুলো যাচ্ছিল। তারপর হঠাৎ একদিন জীবনের ধ্রুবতারা-মা যেন নিভে গেল। জীবনটা কেমন শূন্য মনে হল। জীবন থেকে কি যেন চলে গেল, কি হারালাম তার হিসাব আজও আমি দিতে পারবো না।

প্রিয়া সরদার

আজ যখন সমুদ্রের কাছে এসে একটা একটা করে ঢেউ দেখছি, তখন ছোটবেলাকার কথা, ছোট ভাইয়ের কথা মনে পড়ছে। মা-এর অনুভূতিগুলো আমি যেন এখন উপলব্ধি করছি। আকাশের দিকে তাকিয়ে যেন মাকে খুঁজছি। হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা হাওয়া যেন আমাকে স্পর্শ করে গেলো। মনে হল যেন আজ এত বছর পরে মায়ের স্পর্শ পেলাম, এই পরশের অনুভূতিটা কেমন আমি তা জানিনা শুধু চোখ থেকে জল ঝরে পড়লো।

তৃষা নস্কর, তৃষা হালদার, জয়িতা ঘোষ,
আত্রেয়ী কর্মকার, সর্বাণী গোলদার
দর্শন বিভাগ
দ্বিতীয় সেমেস্টার

লকডাউন ডায়েরী

বর্তমান বিশ্বের আতঙ্ক হলো 'করোনা ভাইরাস'। নতুন বছরের শুরু থেকে চলছে তার দাপট। তাই কেউ কেউ এই ২০২০ সালকে 'বিষ'এর সাল বলছেন। আবার কেউ কেউ প্রহর গুণছেন কবে শেষ হবে এই অভিশপ্ত বছর ? তবে এই ২০২০ সালের 'করোনা ভাইরাস' আমাদের বহু অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করেছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো 'লকডাউন'।

'লকডাউন' মূলত ইংরাজী শব্দ, যার বাংলা অর্থ হলো 'বদ্ধাবস্থা'। এর মূল বক্তব্য হলো 'Stay Home- Stay Safe' অর্থাৎ 'বাড়িতে থাকো-সুস্থ থাকো'।

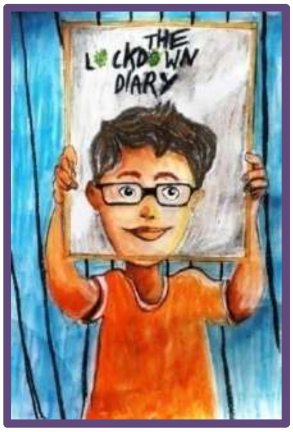

মল্লিকা হালদার

এই বাড়িতে থেকে সুস্থ থাকার জন্য যে পরিকল্পনা তাকে কার্যকরী করে তোলার জন্য মূলত এই বিশ্বব্যাপী লকডাউন শুরু হয়েছে। লকডাউন সাধারণত জনস্বার্থে গৃহীত প্রশাসনিক ব্যবস্থা যার দ্বারা সমস্ত রকম পরিষেবা যেমন-যানচলাচল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র সমস্ত কিছু বন্ধ থাকবে। কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে জনগনের স্বার্থে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় লকডাউন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এই লকডাউনের

ইতিহাসে দীর্ঘকালীন এবং বিশ্বব্যাপী লকডাউন জারি করা হয়েছে এই ২০২০ সালে। এবং এটি করোনা মহামারির সংক্রমণ রুখতে জারি করা হয়েছে। ভারতে লকডাউন জারি করা হয়েছে ২৫মার্চ থেকে। ফলে বিভিন্ন স্থানে আটকে পড়া মানুষেরা এর কথা শুনে দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন। লকডাউন চলাকলীন তাদের ফিরিয়ে আনায় সংক্রমণের হার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই দীর্ঘকালীন লকডাউনের ফলে মানুষ গৃহবন্দী। কেবল মাত্র জরুরি দরকার মেটানোর জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু রাখতে হাসপাতাল, ওষুধের দোকান এবং খাদ্য সামগ্রীর জন্য মুদির দোকান এবং সবজি বাজার নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলছে। অন্যান্য সমস্ত পরিষেবা বন্ধ থাকার কারণে বিশাল অর্থনৈতিক ধাক্কার মুখোমুখি হয়েছে গোটা বিশ্ব। বিভিন্ন দেশের দিনমজুর, নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষেরা নিজেদের রোজগার হারিয়ে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। যান চলাচল বন্ধ থাকার কারণে অসুস্থ রোগী সঠিক সময়ে চিকিৎসার অভাবে মারা যাচ্ছে। লকডাউনের ফলে বিভিন্ন বার্ষিকী পরীক্ষাগুলি অসমাপ্ত হয়ে থেকে গেছে। যার কারণে সমস্ত ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যতও নানান প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। কাজ হারিয়ে ফেলার ভয়ে বহু মানুষ তাদের অন্ধকার ভবিষ্যত এর কথা ভেবে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে।

এই সংক্রমণের প্রথম উৎপত্তি চীন থেকে হয় বলে জানা যায়। র্মাচ মাসের প্রথম দিক থেকেই ভারতে প্রবেশ করে, তার পর তা মহামারীর আকার নিয়েছে, গিয়েছে অনেক প্রাণ। সকল মানুষের জীবনে বিশেষত নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবনে প্রভূত পালা বদল ঘটেছে। লকডাউন, কোয়ারেন্টাইন, অইসোলেশন–এর মতো শব্দ গুলো জায়গা করে নিয়েছে দৈনন্দিন জীবনে।

প্রায় তিন মাসের অধিক মানুষের রুটি রোজগার বন্ধ ভারতবর্ষের মতো একটা দেশে।

যেখানে অন্যান্য দেশের তুলনায় “দিন আনে দিন খাই” লোকের সংখ্যা অনেক বেশী, প্রায় লক্ষাধিক। নিত্য দিনের রোজগারের আশায় সংসার চলে এদেশের কয়েক লক্ষ মানুষের। তারা আজ নিরুপায় বাইরে গেলে করোনা ভাইরাসের কবলে, আর না গেলে ঘরে অভাবের টানা পোড়েনের ছোবলে। সাধারণ মানুষের এই অভাবের জন্য এই দুঃসময়ে সরকার বিকল্প ব্যবস্থা করলেও তাতেও চলছে দেদার কারচুপি।

এই আপদকালীন সময়ে আমাদের সবথেকে বড়ো রক্ষাকর্তা হল ডাক্তার, নার্স এবং পুলিশরা। তারা সারাদিন অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে করোনাভাইরাস আক্রান্ত মানুষদের সুস্থ করে তোলার প্রচেষ্টা করছে। তারা এই দুর্গম পরিস্থিতিতে নিজেদের বাড়িঘর ভুলে সারাদিন ধরে অসুস্থ মানুষজনদের সুস্থ করে তোলার প্রচেষ্টা করছে। এই ভাইরাস ছোট ছোট শিশুদের আক্রান্ত করতেও পিছু পা হচ্ছেনা, সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশুদের এই ভাইরাস থেকে রক্ষা করতে প্রচুর চেষ্টা করছেন ডাক্তার এবং নার্সরা। এই পরিস্থিতিতে চিকিৎসা করতে গিয়ে অনেক ডাক্তার এবং নার্সরা এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। এই ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষদের কাছে তাদের পরিবারের কোনো লোকজনদের প্রবেশের অনুমতি নেই। দুধের শিশুদের কাছে তাদের মায়েদের যাবার অনুমতি নেই। এই পরিস্থিতির দৃশ্য আমি প্রত্যক্ষ করেছি, এবং খুবই দুঃখের সম্মুখীন হয়েছি। এই আপদকালীন সময়ে আমাদের আরও এক রক্ষাকর্তা হলেন পুলিশ। তারা এই সময়ে প্রাণপণ চেষ্টা করে আমাদের সাধারণ মানুষদের এই মারণ রোগটির বিরুদ্ধে সচেতন করছেন। তারা সাধারণ মানুষদের ক্রমাগত সুরক্ষা প্রদান করছেন এবং এইসময়ে আমাদের রক্ষা করতে গিয়ে অনেক পুলিশ, কনস্টেবল মারা যাচ্ছেন। আমরা তাদের এই আত্মবলিদান কোনদিনও ভুলতে পারবোনা।

বাঙালীরা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করছিল সেই চেষ্টা ব্যর্থ করে এর মধ্যেই ঘটল এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় “আম্ফান”এই ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহতা এতোটাই ছিল যে কয়েকশো বছরের পুরোনো গাছগুলিও রক্ষা পায়নি।

এইঝড়ের সন্মুখীন হয়ে উপকূলবর্তী মানুষদের হারাতে হয়েছে মাথার ছাদ, কারোর বা হারিয়ে গেছে সমগ্রবাড়ি। এই ঝড়ের ফলে যে পরিমানে গাছ ভেঙে পড়েছে তাতে যে পরিবেশের প্রাকৃতির ভারসাম্যের কতটা ক্ষতি হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমরা ছোটো থেকে পড়ে ও শুনে আসছি " একটি গাছ একটি প্রান" কিন্তু আজ নগরোন্ননের জন্য সবুজের যে হাহাকার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে সামিল হল এই দূর্যোগও।

কিন্তু এই করোনা মানুষকে শুধু মৃত্যু-ই দিয়ে যায়নি। তা মানুষকে অনেক কিছু শিখিয়ে দিচ্ছে, তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। পরিবারের সদস্যরা যারা কিনা তাদের দৈনন্দিন ব্যক্তিগত কাজে ব্যাস্ত থাকতো এবং এর ফলে পরিবারকে ঠিকমতো সময় দিতে পারত না। পরিবার ছাড়াও আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এমনকি প্রিয় মানুষ গুলোকেও সময় দিয়ে ওঠা হত না। কিন্তু এই লকডাউন এর ফলে বাড়ির সদস্যরা, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজন ও প্রিয় মানুষগুলিকে ঠিকমতো সময় দিয়ে এবং তাদের সঙ্গে মেশার ফলে তাদের মধ্যে একটা সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এছাড়াও মানুষের জীবনে আনন্দের ও প্রয়োজন। তার জন্য মানুষ বেছে নিয়েছে-নাচ, গান, কবিতা, গল্প, লেখা ইত্যাদি ও নানা রকমের হাতের কাজ। দৈনন্দিন ব্যাস্ততার মধ্যে থাকার ফলে এইসব শখের কাজগুলো করার অবকাশ পেত না। কিন্তু এই লকডাউন এর ফলে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য আমরা এখন এই কাজগুলি কে বেছে নিয়েছি। কারণ আমাদের কাছে এখন সময় আছে ফলে আমাদের অনুষঙ্গিক কাজগুলো করার পরেও আমাদের হাতে সময় থাকছে। আমরা আগে বুঝতে পারিনি যে আমাদের মধ্যে এত সুপ্ত প্রতিভা লুকিয়ে আছে যা এখন প্রকাশ পাচ্ছে। শুধু তাই নয় এমন আমরা অনেকেই আছি যারা সবাই একত্রিত হয়ে আমাদের করা নাচ, গান, ছবি আঁকা, কবিতা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে একটা সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারছি আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এর মাধ্যমে। এবং এই ভাবে আমাদের মধ্যে থাকা সুপ্ত প্রতিভা গুলি মানুষকে দেখানোর সুযোগ পাচ্ছি।

আর মানুষ যে একা নয় সেটাও উপলব্ধি করতে শেখালো এই নোবেল করোনা ভাইরাস। এখন প্রতিটা মানুষকে দেখা যাচ্ছে যে তারা কোনো না কোনো রকম ভাবে এই মহামারী দিনে দরিদ্র এবং না খেতে পাওয়া মানুষের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে। শুধু তাই নয়, এ রাজ্যে থাকা অধিকাংশ দরিদ্র মানুষই ভিন্ন রাজ্যে কাজ করে কিন্তু এই করোনা এবং লকডাউন এর জন্য অনেকেই কাজ হারা হয়েছেন। তার ফলে তারা আর্থিক দিক থেকে খুবই দুর্বল হয়ে পড়ার জন্য তারা দুবেলা-দুমুঠো খেতে না পেয়ে মারা যাচ্ছে। এর প্রথম দিকে অনেক পরিযায়ী শ্রমিক যারা নিজেদের পরিবারের কাছে ফেরার জন্য তারা রেললাইনের পথ বেছে নিয়েছিল এবং সেই পথ ধরে হাঁটা শুরু করেছিল এর ফলে তারা হাটতে হাটতে দুর্বল হয়ে পড়েছে না খেতে পেয়ে সেই রেল লাইনের উপর শুয়ে পড়েছে এবং শুয়ে পড়ার পর ফলে দুর্ভাগ্যবশত তাদের মৃত্যু চলে এসেছে, এর জন্য সরকার সেইসব পরিযায়ী শ্রমিক এবং দেশের প্রতিটা মানুষের সুরক্ষার জন্য নানারকম ব্যবস্থা নিয়েছেন।

এখনো এমন অনেক দরিদ্র মানুষ আছে যারা এই অবস্থাতেও দু'মুঠো খাবার পাচ্ছে না। তবে সেইসব মানুষের জন্য সেই এলাকাবাসীরা বা অন্য কোন সংস্থা তাদের জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করেছে যাতে তারা এই অবস্থাতেও সুস্থ ভাবে কাটাতে পারে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মানুষ জাত ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একে অপরের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং একে অপরের কষ্ট বুঝতে শিখছে।

মানুষের প্রাণ যে আজ বড়োই বিপদ গ্রস্থ তা বলা বাহুল্য। সর্বোপরি ভুগছে আমাদের মতো তরুণ প্রজন্ম। স্মৃতির পাতা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে অনেক ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ও কলেজ জীবনের বিশেষ ওস্মরণীয় মুহুর্তগুলি। আমাদের জীবনে শুরুর জায়গাটা থমকে আনলাইন ক্লাস পদ্ধতির বসে উপকৃত হওয়ার সাথে কিছু সমস্যার মুখোমুখি একদল মধ্যবিত্তপরিবারের ছেলে-মেয়ে, বিশেষত নিম্ন মধ্যবিত্ত ছেলে-মেয়েরা। পরিবারের রোজগারের কোনো উপায় নেই তার উপর ইন্টারনেট খরচা, কোথা থেকে আসব ? এই বছরটা হল লড়াই করে যাওয়ার বছর যদি তুমি জিততে পারো তাহলে ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াতে পারবে, আর যারা হেরে যাবে তারা থেমে পড়বে সময়ের টানা পোড়েনে। লড়াই করে চলছি, লড়াই করে যাবো।।

তবে আমার স্থিরবিশ্বাস যে, সবঅন্ধকার একদিন সরে গিয়ে আমরা সবাই একদিন ঠিক আলোর মুখ দেখতে পাবো। এই দূষণমুক্ত মহামারি ছেড়ে একটি প্রাকৃতিক সুন্দর পরিবেশ পুনরায় ফিরে পাব। যেদিন আমরা সবাই আবার মাস্কখুলে স্বাধীনভাবে রাস্তায় বেড়াতে পারবো, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবো।

মৌমিতা ঘোষ
দর্শন বিভাগ
চতুর্থ সেমেস্টার

অতিমারি

মৌমিতা ঘোষ

জানিনা গো, কেন এলে তুমি
মূর্তিমতি আতঙ্ক রূপ ধরে
সুদূর চীনের উহান জন্মভূমি,
কর্ম তোমার সারা বিশ্ব জুড়ে।
লক্ষ, শত শত
শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো
করলে পদানত।
ধ্বংসলীলায় মেতে তুমি, নিচ্ছ বহু প্রাণ
বলতে পারো-আমরা কবে পাবো পরিত্রাণ?
ঝড়ের থেকে বেশী তোমার সংক্রমণের গতি
ও করোনা, বলো আরো করবে কত ক্ষতি?
মানুষ হলো ঘরবন্দী, লকডাউনের জালে
অর্থনীতি, শিক্ষা, সমাজ যাচ্ছে রসাতলে।
উঁচু নীচু-জাত-পাত-ভেদ তুচ্ছ মনে হয়
মানুষরা সব জোট বেঁধেছে পেয়েছে বিষম ভয়,
জাতের লড়াই ভুলে শুধু করছে বাঁচার লড়াই
বুঝলো মানুষ মিথ্যে তাদের শ্রেষ্ঠ জীবের বড়াই।

শত্রু তুমি মানবজাতির করোনা ভাইরাস
তোমার জন্য চারিদিকে বইছে দীর্ঘশ্বাস।
শত্রু তুমি অদৃশ্য, শক্তি সীমাহীন
তবুও তুমি হারবে জেনো
আসবে আলোর দিন।
তোমার সাথে এ লড়াই -এ
যোদ্ধা আছেন যত
ডাক্তার নার্স পুলিশ তাদের প্রণাম শত শত।
বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানীদের চলছে সাধনা
ভ্যাকসিনের অস্ত্রে হবেই ঘায়েল করোনা।
আশার আলো মনে জ্বেলে
চলছি সবাই পথ,
জিতবো মোরা-এ লড়াইএ
এটাই মোদের শপথ।

সঙ্ঘমিত্রা চক্রবর্তী
মনোবিদ্যা বিভাগ
দ্বিতীয় সেমেস্টার

ছন্দহীন কবিতারা

সীমাহীন এই আকাশে
দিশাহীন এই কবিতারা
যেন কিসের অপেক্ষায়
চেয়ে থাকে মুহূর্তেরা ।

প্রতিদিন ভাবে বসে
সে একলা নীরবে
এই সীমাহীন অদৃশ্যতারা কি
কখনো সীমা খুঁজে পাবে?

সুদূর পানে চেয়ে থাকে
সে কেবলই আনমনে ,
যদি সে পায়
সেই অদৃশ্যতার ছোঁয়া !

তবে সে কী পাবে ছুঁতে
সেই নীরবতার কথা
ছন্দ কী পাবে খুঁজে
সেই ছন্দহীন কবিতারা ?

নাকি রয়ে যাবে শুধু স্মৃতি হয়ে
মনে মনে আনমনা ॥

প্রমিতা ভট্টাচার্য
সমাজবিদ্যা বিভাগ
চতুর্থ সেমেস্টার

পরিস্থিতির চিত্রকল্প

ব্যস্ত শহর আজ স্তব্ধতার সঞ্চালক,
যে ভোরের কোলাহলে নিঃশ্বাস নেওয়া দায়,
ছুটির আমেজ খুঁজতে থাকা প্রতিযোগীর দল – হঠাৎ কেমন খবর এলো
বদ্ধ তালায় কাটাতে হবে জীবন ।।
স্বপ্ন মাঝে পড়ল খানিক ভাঁজ, এখনও যে বাকি অনেক কাজ।।
শুরু হল বদ্ধ জীবন, খানিক টা অন্য রকম –
কারোর কারোর খাবারে পড়লো টান,
কারোর আবার কাজ যাবার ভয়ে তটস্থ গ্রাম।
দেশের অর্থ-নীতি তখন বেসামাল।
প্রতিদিনের এই যুদ্ধ জেতার চেষ্টা, বাড়িয়ে দিলো বেঁচে থাকার রেশটা।
দলে দলে দলাদলির থামল নাকো রেশ, কতজনের জীবন হল শেষ।
প্রতিটা দিন অপেক্ষা রয় সুখবরের- করোনা মুক্ত হবে এ দেশ,
বন্ধ তালা খুলবে আবার, জনস্রোতে ভাসবে শহর।।
কাছের মানুষ থাকবে কাছে, দেখা হবে সেই বিজয়ীর দেশে সর্ব শেষে।।

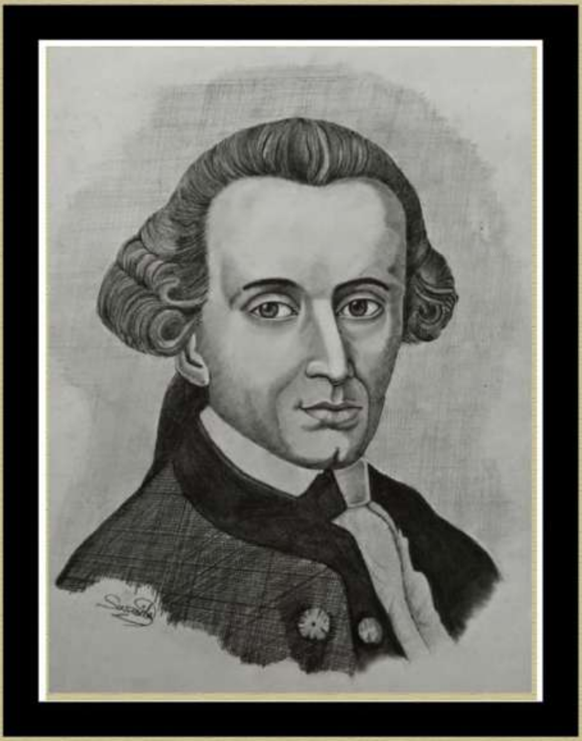

সুস্মিতা কর্মকার
দর্শন বিভাগ
দ্বিতীয় সেমেস্টার

পায়েল দাসগুপ্ত
দর্শন বিভাগ
দ্বিতীয় সেমেস্টার

তুলতুলা নস্কর
দর্শন বিভাগ
দ্বিতীয় সেমেস্টার

পায়েল দাসগুপ্ত
দর্শন বিভাগ
দ্বিতীয় সেমেস্টার

সুস্মিতা কর্মকার
দর্শন বিভাগ
দ্বিতীয় সেমেস্টার

সাথী আদিত্য
দর্শন বিভাগ
দ্বিতীয় সেমেস্টার

শম্পা মাইতি
দর্শন বিভাগ
দ্বিতীয় সেমেস্টার

সঙ্ঘমিত্রা চক্রবর্তী
মনোবিদ্যা
দ্বিতীয় সেমেস্টার

মৌমিতা ঘোষ
দর্শন বিভাগ
চতুর্থ সেমেস্টার

Anushka Banerjee
The Heritage Academy
(Dept. Of Media Science).

Acceptance

It was until the time I saw it coming. The ceiling was engulfed by the enormous fan and it was moving at it's pace like any other day. All of a sudden it felt as if the table standing right beside me, was being hit. The moment I turned towards that loner I saw it was still. That's exactly when I realised it's a habit now. It's something deep rooted inside. It was so obvious that the other sounds were creating a gap in my mind. Closing my eyes, I realised rather felt my heart beating faster than it normally does. No, I wasn't shaking. I was busy removing the blood drops that were oozing out of my chapped lips and I was still trying ny best to tear out that last bit of the dead skin which was apparently stuck in an abnormal way. The entire process seemed normal. It would be wrong if I don't mention this, but I was strong enough to create mark on my hands by scratching them time and again with my pretty sharp nails. I might sound self destructive, which I am, but then again I was gulping it all inside. I was breathing harder. And then suddenly the phone rang. Moving up to get hold of the receiver I felt numb deep inside and the entire body seemed caged. For a while it felt like my body was zoomed out of the world and it was stranded in a corner. Finally, I puked. Earlier hunger pangs made a distinct ring in my tummy. While washing the face, a tint of paleness evidently peeked out. Eyes had huge dark baggages and lips had blood stains. Tears ran down my eyes with an unknown purpose and the heart beat seemed to pump up every moment. The throat was almost shackled and the hands refused to move. It was almost like one wake's up and

faces the demon sitting right in front us. Midnight dreams have already taken a toll on us and it feels like there's a huge vacuum which has it's own pace. To be honest the demon resides inside us. Why is it so difficult to face it? Why can't we look into it's eyes and snatch away the glare? It's there to engulf us within the crevices of melancholy. Listen, it feels like we're being put inside a jar of ants slowly sucking our blood and pinching us once in a while. It's difficult. It's a war zone. And we do not have weapons. Accept it. But irony is, acceptance is our only weapon. Let's deal with it. This is natural. A handful of moments will give us the taste of helplessness. But hey! This certainly does not mean that it will be a dictator our life. It will work it out when it has to. Acceptance is the strength that's needed right now. Holding on to our acceptance make's it easier. We are not alone in this. There's a lot going on. Before everything believe that "THIS IS NORMAL", "IT IS ABSOLUTELY FINE TO FEEL THIS WAS". But, we cannot let ourselves put up with this. Seeking help is not wrong it's the first step towards our own well-being. Anxiety and it's effects strikes through overthinking and it is completely normal. The fact is we cannot let this bother us throughout. It is like slow poisioning. It get's worse everyday. But, we can get through this. This too shall pass. I'm sure we all will combat this entire scenario and rise above all the negativity!

Aheli Ghosal
Sociology Honours
4th Semester

EMBRACE THE CHANGE

Changes are common, but changes due to some uncertain circumstances are a bit difficult to survive. This has been the exact same case for the past few months. Suddenly, we steeped towards a lifestyle that we are not accustomed to. Leaving our busy hectic schedule back, we don’t have much to do. Yes, working from home, online classes and many things have been introduced but these don’t need much effort as we are doing these within the comfort of our home. Now taking account of the situation we need to understand that not everyone has the same capacity to adapt the current changes smoothly. Therefore, this situation calls for not only the health crisis due to Covid-19 but also emotional crisis. The changes have brought with it changes in one’s lifestyle as well, where one might have been

benefited and rest are facing the strong impact of the lockdown. Hence, this gave rise to economic crisis as well.

With the closing of the college we were left with plenty of time to ourselves. The first few weeks went by quite peacefully, but with each extension of the lockdown period there came a reality check. And with this there arose difficulties in task management. If you are some who works better when under pressure then you can resonate with me. This is something that has affected me a lot. This has give me anxiety and stress, and to top it I was all at home which added up to my problems more. To be honest I am a very optimistic person, I try to look into the positive part of every situation. My friends, okay, my close friends always encourage this part of personality with lots of love. Notwithstanding my optimistic viewpoint, I started to feel very low about myself. I couldn't overpower the negativity around me. The place where we seek our peace of mind, or where we think to mind it, social media, was

Suddenly everything went dark.
But I could hear a soft voice from a distance that kept reminding me my purpose.
I tried my best in repeating those perposes to myself.
And then slowly I could sense a ray of light that came searching for me.

also filled with hatred and negativity. There was time during this period where I started to doubt myself. I knew this was not something I would do but the situation surrounding me was forcing me to think this way. But I thankfully got out of it with the help of my wonderful friends and my counselling teacher and a lot of reading and writing helped me a lot. It was during this time that I realized the importance of the proverb “empty mind is a devil’s workshop”. With this realization I started to work on myself. I introduced myself to things that would maintain my mental stability. I would love to share with you my process of healing, may be I will help you too.

Meditation, it is something we all know about but are too reluctant to practice it. But trust me this is a practice that not only helps you to calm your brain cells but also makes the grey matter active. Simple inhalation and exhalation that has the power to regulate the blood flow in our body. According to experts one must meditate for at least twenty minutes a day, but you can start by just doing it for ten minutes.

Maintaining a diary, I love to write so this practice was very therapeutic to me. Writing about your day or just about the parts of the day that made you sad or happy can help a lot. Through writing you can write about your feeling without the fear of being judged. And most importantly this will keep you busy.

Indulge in deep and long conversations, this will help in understanding a situation from different perspectives. Now let’s see, we all have the very bad habit of overthinking and this causes us to perceive the thing in a much complicated way than it truly is. So when we talk to someone about a particular thing which disturbs us we can get a different perspective from the other person which can prove that what we were thinking was not that complicated. Having conversation will also help you to be in company of others.

So these are the three things that is helping me to be in a track. Hope this will help you too to an extent. Yes we are going through a tough time. The changes that are occurring around us might not be easy to accept. But with little efforts we can embrace the change. I know there are people who are suffering a lot more than us. We can help them to accept the change with little gestures with whatever we can. But first we need to be kind to everyone. With all the negativity around we should look for the horizon that has silver lining to it. And remember, “where there is a will, there is a way”.

Ishita Bhattacharya
Department of Counselling Cell

Time Management

I was doing a review with one of my direct reports last week when he said that he wanted my help on how to manage time to do all the activities that he was required to do. He was trying hard to stay on top of the gamut of activities that he had to do, but he found it overwhelming. Now, that resonated with me and I am sure everyone has felt like this at some point in their lives as well and many still do. We all seem to be part of a maddening race and are trying to rush through it not knowing where we are going next. I read a funny comment on the internet that sums up how we feel about this whole thing – “me panicking over due dates then panicking over lack of time and then panicking because I am panicking”.

Nevertheless, I decided to hold a discussion with my team members and ask them if they all felt the same way about time and not surprisingly they all did. I was also struck when I realized one more strange fact – people rarely talk about their problems, unless you take the pain of asking them. Anyway, since all my team members were facing issues with lack of time, I thought of sharing my knowledge with them about time

management - not that I am an expert in this field and if I had shared, with them, how many times I had the sinking feeling myself that there is not enough time to do all the things I want to do, I am sure they would have been left dumbfounded.

I tried to recall what I had studied in a few HBR (Harvard Business Review) articles and a few other books on the same subject. I realized most of what I had read, I had forgotten, but I could not tell that to my direct reports. So, I tried to focus on a method that involves 3 simple steps in order to manage time and carry out the tasks at hand.

Step 1: Set clear goals (either weekly or daily).

You need to do this at the beginning of the week (or when you start your day, if that works for you). List down what are the things you want to accomplish during the course of the week.

Step 2: Rank them in order of priority

Now this is the tricky part. Most people stumble here as they find it difficult to understand which task they should do first and which ones they can try later and in the process often start to procrastinate. That is why you need to prepare a priority matrix. It looks like this:

Importance / Urgency	Urgent	Not Urgent
Important	Do Do it now. Customer Enquiries / Escalations Pressing Problems Deadlines	Decide Schedule a time for it. Self-Development Planning Exercise Training
Not Important	Delegate Who can do it for you? Book a ticket Schedule a meeting Answer some e-mails	Delete Eliminate it. Watching TV Checking Social Media Unnecessary chit chat

This matrix has many versions and it is known as the Eisenhower Matrix. The examples given are just for the purpose of understanding and are not an exhaustive list. The question is how you determine which tasks to put under which box. For example, how do you know which task is important and not urgent? And so on and so forth. At least that was the problem my team members were facing.

A general rule of thumb is to consider the impact of each task. Ask yourself some questions like:

- What will happen if I don’t do this task now?
- What will happen if someone else does this task?
- What benefits can we get if I complete this activity?
- Who are the stakeholders and what is at stake?
- In the long run (6 months or a year) what will matter most?
- What can I eliminate and what can I delegate?

This will help you determine where to put the task in the Eisenhower matrix.

President Dwight Eisenhower had summed it up succinctly – “What is important is seldom urgent and what is urgent is seldom important”.

Step 3: Do the tasks.

It is all good to think and plan and prepare matrices, but eventually you have to do the work. The sooner you get them done, the better. Just do the tasks according to the matrix you have prepared and get them of the list. This will give you a sense of accomplishment and inspire confidence. You will feel more relaxed. Once the week is over (or the day, if you follow a daily plan) – review what you have accomplished and ask what could you have done better. Time management is also a skill and it requires patience and practice to master it.

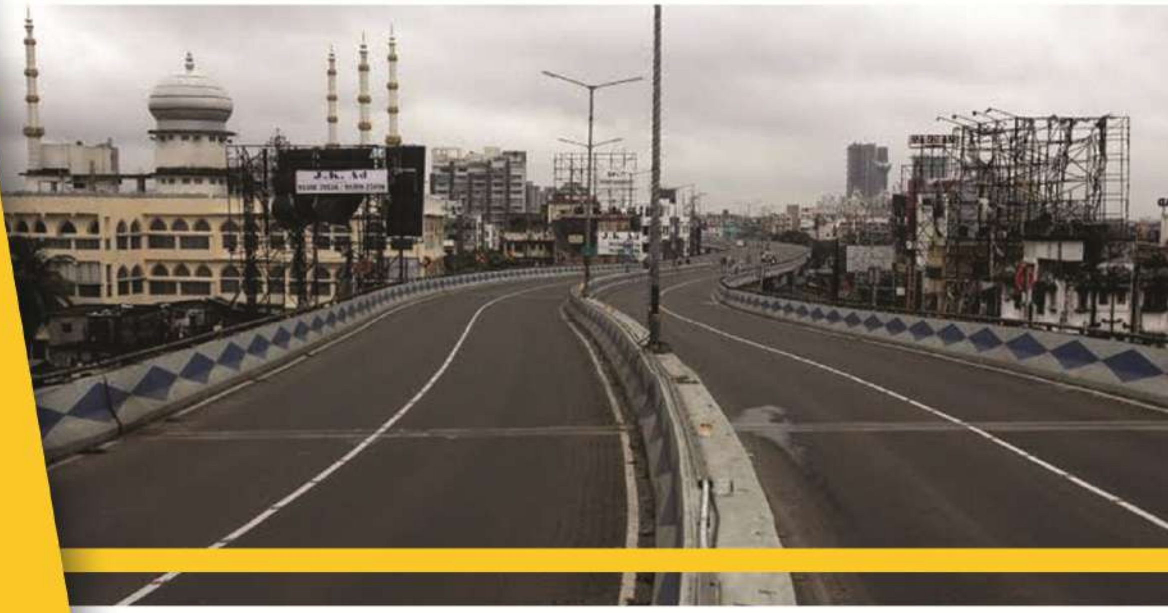

Covid-19

Shaona Ganguly
Sociology Hons
4th Semester

Dealing with the Pandemic Situation

Never I thought that I had to write about this type of situation that we are all facing in this year of 2020. Not only just one country, but the whole world is suffering and going through the same situation. It is really disheartening to see so many people are dying each and every day and so many are getting infected.

We never know who is the next person the virus will attack .It can be you or me too ! I thought the virus the panic all will end in month or so but I was wrong there. It is been more than 6 months we are in this same situation where

someone is dying everyday. The virus is spreading like a fire in a forest. We are all getting sick whether it is physically or mentally. Due to the Covid-19 Situation people are getting sick mentally too. Mental issues can be seen more now a days. People are getting depressed , stressed, anxious, some are stressed for their earnings some are stressed for losing their job due to the economical disbalance of the country ,people are helpless and often they are deciding to end their precious lives . How can a pandemic affect so much – this is really shocking for me. I myself feel as if I am trapped inside a room with no place to go. I cannot meet people outside. I cannot do anything that I used to do when everything was normal.

I feel that people are not fully aware of the gravity of the situation and if they still behave like this as if 2020 is a normal year and live the life they were used to, then they are going to face some horrible consequences. Anyone can get affected. It is really not a normal year. Apart from all the negative things I am trying to do something positive to keep myself distracted. I am learning new stuffs. I am trying to learn how to do art, how to edit photography, how to practice drawing and

how to, learn new techniques. I am also trying to help my mother in doing some household chores. Now a days people get so less time to spend with their family. So we can use this time by staying together and helping each other in the family. I hope and pray that the situation gets better as soon as possible. I am feeling very upset but I am trying to overcome myself and pray for everyone's good health. I am keeping myself busy with all the things I love – Arts, listening songs, taking care of the health, taking care of my family.

I know all the researchers are working hard to find a solution to end this virus and I hope we soon can get a proper solution to end whatever is happening in our world.

In these few months people, the society and almost everything has changed. Society is still changing. But that is how society works – by changing, by evolving. And we should adapt all the changes with the society or we'll be behind. This is now the new way of living life – maintaining social distancing, wearing masks, avoiding crowded places , maintaining the hygiene. It is hard to change all our habits but we have to go with the flow. It is not only us but everyone is trying to adapt to the new life .This is the new normal. Without change a society cannot function. And we should change the way we used to live with the new way of living. For our own benefits we should change with the changing society. I believe that better days are coming soon. The whole world is changing and we should believe in the change and try to take it in a positive way. We should try to remain calm in both mental and physical ways. So we should take this as a positive way. We should stand together united without losing Humanity. And If we stand together strong no one can break us down not even the Covid -19 Virus.

Tina Dey
sociology department
Semester-4th

Minding our minds during the (COVID-19)

In the year 2020 times have become difficult times for all of us as we hear about spread of COVID-19 from all over the world, through television, social media, newspapers, family and friends and other sources. The most common emotion faced by all is Fear. It makes us anxious, panicky and can even possibly make us think, say or do things that we might not consider appropriate under normal circumstances. Every thing was locked down to fight Corona-virus. Lockdown is meant to prevent the spread of infection from one person to another, to protect ourselves and others. This means, not stepping out of the house except for buying necessities, reducing the number of trips outside, and ideally only a single, healthy family member making the trips when absolutely necessary. If there is anyone in the house who is very sick and may need to get medical help, you must be aware of the health facility nearest to you. Handling social isolation, staying at home can be quite nice for some time, but can also be boring and restricting. Here are some ways to keep positive and cheerful.

1. Be busy. Have a regular schedule. Help in doing some of the work at home.
2. Distract yourself from negative emotions by listening to music, reading, watching an entertaining programme on television.

Shreyoshi Roy

If you had old hobbies like painting, gardening or stitching, go back to them. Rediscover your hobbies.

3. Eat well and drink plenty of fluids.

4. Be physically active. Do simple indoor exercises that will keep you fit and feeling fit.

5. Sharing is caring. Understand if someone around you needs advice, food or other essentials. Be willing to share.

6. Elderly people may feel confused, lost and need help. Offer them help by getting them what they need, their medicines, daily needs etc.

7. If you have children at home, keep them busy by allowing them to help in the household chores - make them feel responsible and acquire new skills.

Persons with mental illness and persons who had previous mental illness may face newer challenges during self isolation or Covid infection:

1. They would also have the same fears and stress as others which may worsen their previous mental health condition

2. Social isolation may make them more withdrawn, moody and irritable

3. They may not seek/ get easy access to medicines and counseling. Help and support is vital for persons with mental illness from their families and other care givers. Health helplines can provide support, in addition to regular taking of prescribed medication, a regular daily routine, keeping engaged and positive. Remember, good mental status in the difficult times may win you the battle more easily!

Shubhangi Dey
Sociology Department
Semester-4th

YOU ARE NOT ALONE

As social media platforms continue to churn out one productivity contest after another, it becomes even more essential to remind ourselves that it is ok to feel worried, anxious, stressed, lonely and even frustrated at the outbreak and its aftermath. If the constant fear of being locked alone away from the people whose companionship you cherish might end up making you feel bitter and irritated, it is important to let go of this feeling. Even if it feels otherwise, you will be surprised to know that a lot of people may actually relate to the same emotional experiences.

While college from home may look like a sweet deal during the present scenario, the balance between college and personal space has certainly gone for a toss for me. The constant feeling of missing your friends and the sheer fun you used to have makes me cringe from within. This helplessness of not having anything under control disturbs my inner peace of mind and happiness. After a certain point the loneliness kicks in and makes me feel depressed and anxious.

চৈতালী

Recently during the lockdown I have lost a very dear family member. The grief is still very strong and makes my heart heavy with pain. The sorrow of not being able to discuss the emotions I am going through makes me more miserable. Being an extrovert it is almost impossible from my end to stay within a shell without socialising.

The uncertainty of the mere future boils down my self confidence and I start questioning my capabilities. No amount of assurance helps me to come out of this turmoil. In spite of knowing that the whole world is going through the same situation and everything is momentary the feeling of hollowness is constant. The fact that so many individuals are dying and getting affected everyday makes me worried about my own family and near and dear ones. The thought of loosing anyone to this evil makes me paranoid and numb. Among all those negativity the only thing that keeps me sane is the feeling of gratefulness for having proper shelter, food and a loving family and friends. Hopefully everything will end soon . As the saying goes that “There is always light at the end of the tunnel”- this pandemic in the same way has helped me to discover certain facts about myself. It has given me the clarity to know myself better and to understand my strength and weaknesses.

The experiences that I have accumulated during this pandemic has taught me that as an

individual I am strong and can keep my patience during the toughest of scenarios. It has given me the sanity to tolerate every little things. I have become more humble and grateful towards the approach of life. I have stopped taking anything for granted.

Besides helping me to strengthen myself it has also taught me about my inner potentials in terms of creativity. With lots of time in hand I have discovered my passion for dancing and have started to explore the different forms. I have been passionate about this field since childhood but never got the time to pursue it due to different educational deadlines. It gives me immense joy to again re-connect with my roots and get a hobby to cherish and refresh myself every time I feel low.

To end with I would like to sum up my experience about this lockdown as an experience of mixed feeling consisting of various positive and negative aspects. In a way it has taught me a lot about life in general but also made me face some of the hardest hurdles. The feeling of respecting everything now and being granted has made me more humble towards life and the same will help me in the long run. Keeping everyone in my prayers I hope things get back to normal and the world heals so that the normalcy of life again gets restored.

Ishita Bhattacharya
Department of Counselling Cell

How do you deal with depression?

"You are only given one little spark of madness.
You mustn't lose it." – Robin Williams.

I heard a joke about depression, once. It's a dialogue between two friends who were suffering from it.

"You know, they say that depression is the absence of hope."

"Ha! No way. I hope to die every day. So you are wrong."

But what is depression anyway? Is it just the absence of hope or is it more than that?

The American Psychiatric Organization defines it as – "Depression (major depressive disorder) is a common and serious medical illness that negatively affects how you feel; the way you think and how you act. Depression causes feelings of sadness and/or a loss of interest in activities once enjoyed. It can lead to a variety of emotional and physical problems and can decrease a person's ability to function at work and at home."

Well, that is a dispiriting definition at the very least. What disturbs me most is the usage of the words "common and serious medical illness". Why does it disturb me? First, it gives me the impression that we know that there is a problem and many are affected by it, but nothing can be done about it. That always makes me feel despair. Second, the phrase raises two important questions and the answers are anything but pleasant.

A) Just how common is depression? According to the World Health Organization (W.H.O), there are more than 300 million people from different age groups who suffer from it.
B) Just how serious is depression? It is a leading cause of disability worldwide. In worst cases, it leads to suicide. And close to 800000 people commit suicide every year (according to W.H.O).

Experts opine that depression can happen to anyone, even to people living in the most ideal circumstances. Feelings of existential dread and despair are inherent traits in many human beings. It can affect people who have suffered extreme losses (for example loss of a loved one), or those who are struggling with poverty, or even those who are immensely successful in every way. While we may find it logical to

understand why people may feel depressed in the first two cases, it is baffling to understand the last one.

I did some research and found out that there are six different categories into which depression can be classified:

Situational – caused by tragic events such as loss of jobs, death of a loved one, divorce etc.

Hormonal – caused by hormonal imbalance.

Biological – this is genetic in nature.

Seasonal – even seasons can make you feel depressed (It applies to me, I feel depressed during the monsoon season).

Intrapersonal –low self-esteem, feelings of lack of self-worth.

Existential – lack of meaning and soul connection.

Existential depression is the most

difficult form of the disease. In a nutshell, it is a profound spiritual crisis that one goes through. It is the hardest to detect and therefore the hardest to cure as well. Do you want to learn more about its symptoms and cures?

Here are few basic tips on how to deal with bouts of depression:

Smile and make others smile- Need I say more? It is easy to be swept away by the sorrows that life throws at us. Cry. By all means. Everyone does, when it hurts. But don't forget to see the little things that can make you smile. If you cannot smile, remember that there are others whose pain is greater than yours. You have no right to make their lives any more miserable than it already is. Try to make them laugh and may be in that attempt you will laugh a little as well. The world does not want to see a sulky face. Smile and shine.

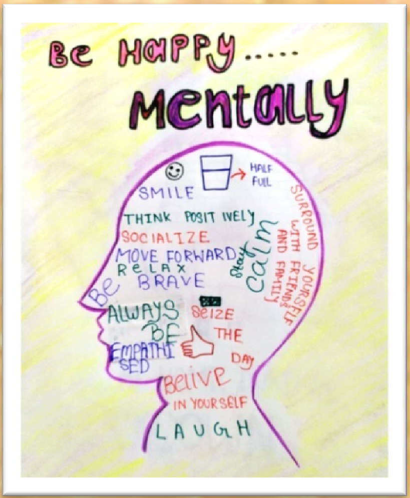

Manisha Mallick

Seek professional advice – Do not misinterpret this state of your mind to be harmless. It can cause more damage than you can imagine. Medical intervention can make the difference between living and dying. Change your physical state radically - When you catch yourself feeling depressed, do something drastic. For example, just run, or walk fast, or jump around for a while, or pump iron, or jump into a pool and swim.Or play any sport that demands a lot of physical activity. Do anything. When you do any physical exercise, your body releases more endorphins (that's a feel good hormone) and often it helps in combating feelings of despair.Involve yourself in something you feel attracted to – Music can be one of the best soul searching tools, so can be painting, teaching, reading, writing,

travelling, acting or martial arts. You may find the answer to your spiritual crisis in any of those endeavours or perhaps in something else. Who knows? Try something crazy – How about bungee jumping? How about skydiving, river rafting or paragliding? Anything wild and crazy will do. But be smart and be safe. Take professional help where necessary. The idea is to change your state of being. Challenge yourself with something and follow through.

Talk to a friend or a loved one – Talk about how you feel. Everyone needs someone they can talk to. Bare yourself emotionally in front of that person. Tell your story. Sharing your feelings with a person close to your heart is one of the most beautiful things in life. It is an invaluable gift. Nothing makes the bond stronger than a soulful dialogue. These are moments that both of you will cherish later.

Help others – Seek an opportunity to help someone every day. Anyone. If you can help more than one person,that's great. Congratulations! You have done well. But help at least one person every day. Do not expect anything in return. Just do it, anyways. Remember, you are doing it for yourself and not for anyone else.

Sister Nivedita came to India from England being inspired by her guru, the

dynamic Swami Vivekanandaand after putting in conscientious efforts, she found it difficult to adjust to the new life of sacrifice and service. She felt despair and approached Vivekanda and told him that she felt discouraged. Vivekanda's advice to his disciple was simple. "Encourage others". And she did. By doing that, she found the strength to continue on her journey towards relentless and unparalleled service for the people of this country.

If you forget everything else, and just remember the first and the last tip to fight depression, you will do just fine.

The interesting thing is that some of the people we turn to when we are sad, to make us laugh, were also deeply melancholic in their real lives. Charlie Chaplin and Robin Williams are great examples of this fact. They didn't allow the world to see their pain. Instead, they made the world laugh. They inspired generations. No matter what trepidations they felt inside, no matter what pain they endured, no matter how wistful they felt, they also found the strength to go out and not only see life in a new light but also made a difference to the world.

Here are some inspiring quotes from the legend himself, Charlie Chaplin.

"A day without laughter is a day wasted."

“To truly laugh, you must be able to take your pain and play with it.”

“Laughter is the tonic, the relief, the surcease for pain.”

“I have many problems in life, but my lips don’t know about those problems. They always smile.”

“My pain may be the reason for somebody’s laugh. But my laugh must never be the reason for somebody’s pain.”

“You need power only when you want to do something harmful, otherwise love is enough to get everything done.”

“Life is a tragedy when seen in close up, but a comedy in long shot.”

This is a great lesson from the legend. At times we all need to see the world as it truly is – a big charade! Nothing that causes you to despair will last forever. So why worry about it? Accept the fact that your life is messed up in certain areas, so is everyone else’s. Humour is not just an escape from depression. It is perhaps the best therapy.

If this article helps even one person, I will feel that it was worth writing. Share it. I would love to hear your thoughts on this.

Ayushmita Ghosh
Sociology Honours
4th Semester

UNCERTAINTIES OF LIFE

Life is filled with uncertainties, especially at times like this. While many things remain outside our control, our mind set is key to coping with difficult circumstances and facing the unknown.

Uncertainty is all around us, never more so than today. The current COVID-19 pandemic has heightened uncertainty over the economy, employment, finances, relationships and of course physical and mental health. Yet as human beings, we crave security. We want to feel safe and have a sense of control over our lives and well being. Fear and uncertainty can leave us feeling stressed, anxious and powerless over the direction of our life. This pandemic situation is taking a toll on our mental health and trapping us in a downward

spiral of endless "what ifs" and worst case scenarios about what tomorrow may bring.

This pandemic situation is becoming very stressful day by day. Fear and anxiety about this new disease and what could happen is overwhelming and causing strong emotions in me. Public health actions such as social distancing is making me feel isolated and lonely as I am unable to go out with my friends and family. Not being able to see my closest relatives is giving me huge pain. It becomes frustrating at times as well. However, these actions are necessary to stay healthy and to reduce the spread of COVID-19. There is always a fear that is working within me regarding the health of my loved ones and my own health. Even if I am sneezing or coughing I am panicking that I might be covid positive. Due to this situation most of the people are loosing their jobs for which the suicide rate is increasing. Everyday the news of someone committing suicide makes me feel disheartened. The educational system has collapsed. The schools, colleges and universities are all closed. We do not have any idea what future is holding for us. I am terribly worried about my career. Until this pandemic is ending the schools and colleges will not be able to reopen. So many people are loosing their lives and people loosing their loved ones are becoming more vulnerable at this point of time.

After everything I personally feel that this pandemic situation is teaching people a lot of good things. We are becoming more aware of our neighbours than we used to. People are checking on their neighbours to see if they need any supplies or just to check if they are okay. It's strange that at a time when we are not allowed to go out physically to see our friends, we are making more of an effort than ever to keep up with them.

One of the most positive signs is that the earth is healing. With fewer cars on the road, hardly any planes in the sky and less people to litter the streets, our world is starting to heal itself. I also feel that this pandemic situation has made people realize the importance of personal hygiene.

I hope this situation will get over and we all will be able to lead a happy and safe life once again. Every coin has two sides. Though this pandemic situation is making our lives miserable it is also making us realize the true value of lif

SREEJITA GHOSH
SOCIOLOGY DEPARTMENT
Semester-4th

Learning to live with a Pandemic

We have to seek within and find the strength to combat this malaise.

John Donne's famous words **"for whom the bell tolls, it tools for thee,"** are becoming so real with every passing day, with the fear and thought of the inevitable grabbing each of us. All this because **COVID-19** has chosen to become our **"Unwelcome Forced Guest."**

The reports that people young and old, infirm or otherwise are passing on, affected by the virus, are further strengthening fear and anxiety.

While all of us know that we have little or no control over what is happening around us and to us because of the pandemic yet each of us is consumed by anxiety.

The **COVID-19** pandemic has massively disrupted our lives. Besides direct devastation of health, the epidemic and the lockdown have had myriad indirect effects, be it on the environment, livelihoods, or supply chains. There has been a lot of discussion around the lack of capacity of our health care system to fight this epidemic. But

the impact of **COVID-19** and the lockdown on the **'business'** of health care has not been examined. This has an important bearing on the larger arena of health care for our citizens in the near future. The cartelisation of health care has been naturally curbed during the pandemic. **'Cut practice'**, with doctors and hospitals prescribing tests, drugs, referrals and procedures in return for commission is entrenched in India. This leads to significant negative consequences, be it increased patient expenses, patients not reaching the right doctor or not getting the appropriate investigation and also an erosion in doctor-patient relationship and the image of the fraternity. It puts ethical doctors in a quandary.

In general, the medical fraternity in India has risen admirably to the challenge of **COVID 19**. The call of duty has led many to don Coronavirus Warrior Outfits and set aside for now. It has forced them to consider alternative paradigms. Public respect for the profession has also improved. If we can seize this chance to correct undesirable practices, which have become an albatross around our neck, it may help the return of trust in the doctor-patient relationship, which was severe threat before the pandemic. In the middle of gloom, this is a **window of opportunity.**

The e-magazine of Basanti Devi College is a hopeful beam of light amidst the dark deep despair that has been 2020. The joint effort of teachers and students of the college in the form of this e-mag is a commendable achievement in the face of a deadly pandemic which has nothing been short of something from a dystopian fiction. On behalf of the magazine committee of the college we welcome this effort wholeheartedly.

Dr.Upasona Ghosh

Convenor, Magazine Committee

Basanti Devi College